উভয় বাঙলা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুস করে দুটো মাথার উপর দিয়ে পঁচিশটি বছর কেটে গেল। উভয়ের তন্দ্রাতুর, নিদ্রামগ্ন। কিন্তু নিদ্রাভ্যাস রিলেটিভ—কোনো কোনো ক্ষেত্রে। গীতাও বলেছেন, "যা নিশা—ইত্যাদি।" পূব বাঙলা এবং পশ্চিম বাঙলা দুজনাই ছিলেন একে অন্যের সম্বন্ধে অচেতন সুষুপ্তি-দুঃস্বপ্ন মিশ্রিত নিদ্রাতুর অবস্থায়। অথচ যে যার আপন কাজকর্ম করে গিয়েছে আপন মনে। পঁচিশ বৎসর ধরে।

ঘুম ভেঙেছে। রিপ ভান উইঙ্কলের ঘুম ভেঙেছিল এক মুহূর্তেই কিন্তু তাঁর ঘরবাড়ি আত্মজন এবং গোটা গ্রামকে চিনে নিতে তাঁর সময় লেগেছিল অনেকটা। কিন্তু তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। যতটা সময়ই লাগুক সেটা ছিল মাত্র একজনের সমস্যা।

দুই বাঙলা বিরাট দেশ। জনসংখ্যা প্রচুরতম। একে অন্যের চেনবার জানবার জিনিস বিস্তর! সুতরাং সে-কর্ম সমাধান করতে কবৎসর লাগবে সেটা বলা কঠিন। এবং সেটাও যে রুটিন মাফিক মসৃণ পন্থায় অগ্রসর হবে সে সত্যও শপথ গ্রহণ করে বলা চলে না। আমরা প্রতিবেশী। খৃষ্ট আদেশ দিয়েছেন, "প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।"

কারণ তিনি জানতেন, প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে পারাটা দূরে থাক, বহু ক্ষেত্রে সহ্য করাটাই সুকঠিন। দূরের জন আমার বাড়ির শখের বাগানটাকে ডিমের খোসা কাঁঠালের ভূতি ফেলে ফেলে তাঁর প্রাইভেট আঁস্তাকুড়ে রূপান্তরিত করতে পারে না, আমার অর্ধাঙ্গিনীর দ্বিপ্রহরাধিক স্বতশ্চল বিকট বেতারের উৎকট চিৎকার দূর-জনের পরীক্ষার্থী পুত্রের অধ্যয়ন প্রচেষ্টাকে লণ্ড-ভণ্ড করতে পারে না। প্রতিবেশীর ঝি পারে, গৃহিণীর বেতার পারে। অতএব গোড়ার থেকেই কিঞ্চিৎ সচেতন সমঝোতা মেনে নিয়ে পুনঃপরিচয়ের ভিত্তিস্থাপনা করতে হবে। আর এও তো জানা কথা।

"নূতন করে পাবো বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ"।

একেবারে সর্বক্ষেত্রে যে হারিয়েছিলুম তা নয়। এখানকার বিশেষ সম্প্রদায় এই পঁচিশ বৎসর ধরে যে কোনো সময়ে বলে দিতে পারতেন নারায়ণগঞ্জে এই মুহূর্তে শেয়ার-বাজারে জুট মিলের তেজীমন্দীর গতিটা কোন্ বাগে। এ পারের বিশেষ সম্প্রদায়ও তদ্বৎ বলতে পারতেন এ-পারে টেণ্ডুপাতার চাহিদা রফতানীর ওজনটা কোন্ পাল্লায় বেশী।

কিন্তু হায়, দেশ পত্রিকার সম্পাদক, ১০০% পাঠককুলের ৯৯% পাট ও টেণ্ডু সম্বন্ধে উদাসীন। বহু গুণীন তাই বলেন বাঙালীর এই উদাসীনতাই তার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে দিয়েছে।

যতদিন সে শুভবুদ্ধির উদয় না হয় ততদিনও কিন্তু বর্তমান সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। "দেশ" পত্রিকার পাঠক চায় জানতে ওদেশে উত্তম উত্তম উপন্যাস গল্প কি বেরল এই পঁচিশ বৎসরে? যদিও তারা লেখে বাঙলাতেই তবু তাদের সুর ভিন্ন, সেটাতে নতুন কিক থাকে, বীরভূমের খোয়াইডাঙা গোরুর গাড়ি, ওদিককার নদী-বিল নৌকো দুটোর রং তো এক হতে পারে না। এক রবীন্দ্রনাথে ব্যত্যয়। তাঁর জীবনের প্রথমাংশ কাটে জলচরের দেশে নদীপাড়ে, শেষাংশ কাঁকড়ধুলোর দেশে খোয়াইয়ের পাড়ে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি তাঁর অলৌকিক প্রতিভা দিয়ে করেছেন দুটোরই সমন্বয়। অন্য লেখকদের বেলা দুটোর রঙ আলাদা আলাদা থাকে।

অন্যরা চান ওপারের কাব্য নাট্য ও বিভিন্ন রসসৃষ্টি। পণ্ডিতরা চান প্রাচীন কবিদের ছাপাতে প্রথম আত্মপ্রকাশ, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো জিনিস যা পুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য বিতরণ করে। বললে পেত্যয় যাবেন না, কলকাতারই এক যুবা আমাকে একদা জিজ্ঞেস করছিল, পূব বাঙলায় যে "ইরি" (ইন্টারনেশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটুট না কি যেন পুরো নাম) ধান ফলানো হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমার কাছে মুদ্রিত কোনো-কিছু আছে কিনা? (এ স্থলে যদিও অবান্তর তবু একটা খবর অনেককেই রীতিমত বিস্মিত করবে : বাঙলাদেশের একাধিক বিশেষজ্ঞজন বলছেন, "বর্ষাকালের আউশ ধান আমাদের বৃহত্তম পরিমাণে উৎপন্ন খাদ্য। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল অতিবৃষ্টি বন্যা এবং অনাবৃষ্টির উপর। পক্ষান্তরে হেমন্তের আমন যদিও আউশের তুলনায় উৎপাদন অনেক কম তবু তার একটি মহৎ গুণ যে পূর্বোক্ত ঐ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর নির্ভর করে না। অতএব আমাদের উচিত আউশের তুলনায় প্রচুরতম আমন ফলানো—এক কথায় পূর্ব ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ পাল্টে আমন হবে আমাদের প্রধান চাষ ও আউশ নেবে দ্বিতীয় স্থান। অবশ্য তার জন্য দরকার হবে লক্ষ লক্ষ ট্যুবওয়েল।" শেষ পর্যন্ত তাই যদি হয়, তবে হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা মানুষ দেবে পাল্টে—সেটাতেই জাগে আমাদের মত অজ্ঞজনের বিস্ময়!)

বাঙলাদেশের লোক কি পড়তে চায়, তার ফিরিস্তি অবশ্যই দীর্ঘতর।

যে কমাস ঢাকায় কাটালুম তার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সে-দেশে সব চেয়ে বেশী কাটতি "দেশ" পত্রিকার। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে রাখা ভালো যে বিশাধিক বৎসর কাল তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় সর্ববাবদে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে "দেশ"-এর গল্প উপন্যাস ভ্রমণকাহিনী আধুনিক কবিতা, কিছুটা খেলাধুলোর বিবরণ এবং এদিক ওদিক দুএকটি হাল্কা লেখা ছাড়া অন্যান্য রচনা, বিশেষ করে গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রতি নবীনদের চিত্তাকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম। তার প্রধান কারণ বাঙলাদেশেই খুঁজতে হয়। এই বিশাধিক বৎসর ধরে তাদের আপন দেশেই সিরিয়াস রচনা গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে অত্যল্প। কাজেই এ-সব বিষয়ে নবীনদের রুচি সৃষ্টি ও অভ্যাস নির্মিত হবে কোথা থেকে? যুবজনের জন্য "দেশ"-এর মত একটি পাঁচমেশালী পত্রিকা তাদের ছিল না যাতে করে কথাসাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সাময়িক কৌতূহল বশত দুএকটি তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি পড়ে ধীরে ধীরে ওদিকে রুচি বৃদ্ধি পেত এবং শেষ পর্যন্ত দুপাঁচজন প্রবন্ধ-পাঠক অবশেষে নিজেরাই গবেষক হয়ে যেত।...."দেশ" পত্রিকার প্রবন্ধ-পাঠক একেবারেই নেই, সে-ধারণা ভুল। কিন্তু যাঁরা পড়েন তাঁদের বয়স ৫০/৫৫-র উপরে। এঁরা কলেজে, পরে পূর্ণ যৌবনে তাঁদের চিন্তার খাদ্য আহরণ করেছেন "প্রবাসী" "ভারতবর্ষ" ও পরবর্তীকাল থেকে পার্টিশেনের পরও কয়েক বৎসর "দেশ" থেকে। এঁরা আবার নূতন করে পশ্চিম বাঙলার ঐতিহ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঝালিয়ে নিচ্ছেন। আশা করা যায় যুবক যুবতীরা ধীরে ধীরে এ-দলে ভিড়বেন।

বলা একান্তই বাহুল্য "রঙ্গজগৎ" অংশটি তরুণ-তরুণীরা গেলে গোগ্রাসে এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অতুষ্ণ্য তাদের মনস্তাপ—"হায় কবে আসবে সে সুদিন যখন এ ফিল্মগুলো দেখব?" যে-সব স্টার গান গাইতে পারেন এবং প্লে-ব্যাক গাইয়েদের নাড়ী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নক্ষত্র তারা নিজেদের হাতের চেটোর চাইতে বেশী চেনে—কলকাতা বেতারের কল্যাণে।

বস্তুত বলতে গেলে ঢাকা ও কলকাতা বেতার এই দুটি প্রতিষ্ঠান মাত্র দুই বাঙলাকে একে অন্যের খবর দিয়েছে, গল্প গান কথিকা শুনিয়েছে নানাপ্রকার ব্যানের উপর দিয়ে, হাওয়ায় হাওয়ায় পঁচিশটি বছর ধরে।

তার পূর্ণ ইতিহাস লিখতে গেলে পুরো একখানা কেতাব লিখতে হয়॥

উভয় বাঙলা—বিসমিল্লায় গলৎ

গত পঁচিশ বৎসর ঢাকা এবং কলকাতা কে কতখানি রসসৃষ্টি করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশ করেছে সে নিয়ে তুলনা করা নিতান্তই অসঙ্গত। এই পঁচিশ বছর ধরে পূর্ব বাঙলাকে একসঙ্গে চালাতে হয়েছে লড়াই এবং পুস্তক লেখন। অদ্ভুত সমন্বয় বা দ্বন্দ্ব। সেপাই কলম জিনিসটাকে বিলকুল বেফায়দা জানে বলে টিপসই দিয়ে তনখা ওঠায়, আর কবি, যদিও বা তিনি বীররস সৃষ্টি করার সময় তরবারি হস্তে বিস্তর লম্ফঝম্প করেন তবু তিনি জানেন, ও জিনিসটা একদম বেকার—ওটা দিয়ে তাঁর পালকের কলম মেরামত করা যায় না। বাঙলাদেশের লেখক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, এমন কি পাঠককেও লড়াই করতে হয়েছে অরক্ষণীয়া বাঙলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে, এবং প্রথম দুইশ্রেণীর লোককে সঙ্গে সঙ্গে লিখতে হয়েছে পাঠ্যপুস্তক থেকে আরম্ভ করে হিউ এন সাঙ বর্ণিত ময়নামতী লালমাই সম্বন্ধে গবেষণামূলক পুস্তক—পূর্ব পাকিস্তান জন্ম নেবার প্রথম প্রভাত থেকে। একই ব্যক্তি কভু রণাঙ্গণে, কভু গৃহকোণে।

প্রথম দিন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান স্লোগান তুলেছে, এক রাষ্ট্র, এক ভাষা, এক প্রভু (কাঈদ-ই-আজম=জিন্নাহ)। অর্থাৎ পূব বাঙলায় চালানো হবে উর্দু এবং বাঙলাকে করা হবে নির্মূল। আমেরিকার নিগ্রোরা যে রকম তাদের মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে ইংরিজি গ্রহণ করেছে, পূর্ব বাঙলার তাবল্লোক হুবহু সেই রকম বাঙলা সর্বার্থে বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করবে। জানিনে, পূব বাঙলার মাঝির প্রতি তখন পশ্চিম পাক থেকে কি ফরমান জারি হয়েছিল—তারা ভাটিয়ালি সুরে উর্দু ভাষায় গীত গাইবে, না "কির্সুদ্দ উর্দু গজল কসীদা" গাইবে উর্দু ঢঙে?

কিন্তু মাঝির উর্দুই হোক, কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেনসেলারের উর্দুই হোক, সে উর্দু শেখাবে কে? নিশ্চয়ই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে? কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু কই?

বাঙালী পাঠক এ স্থলে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হবেন। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশ বুঝতে পারছি, পূব বা পশ্চিম পাকের এ সব ইতিহাসের প্রতি আমার নিত্যদিনের সরল পাঠকের বিশেষ কোন চিত্তাকর্ষণ নেই। কিন্তু তবু আমাকে বেহায়ার মত এসব রসকষহীন কাহিনী শোনাতেই হবে। (যতদিন না সম্পাদক মহাশয়ের মিলিটারি হুকুম আসে হ্-ল্-ট্। দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে তিনি এ ফরমান কখনো জারি করেন নি, কিন্তু তাঁরও ধৈর্যের সীমা আছে, তিনি হল্ট্ হুঙ্কার ছাড়া মাত্রই আমি হুশ করে আমার জীবনব্যাপী সাধনার ধন গাঁজা-গুল-কেচ্ছার উর্ধ্বস্তরে পুনরপি উড়তে আরম্ভ করবো)। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস : দুই বাঙলা ক্রমে ক্রমে একে অন্যের কাছে আসবে। পঁচিশ বৎসরের বিচ্ছেদের পর নূতন করে একে অন্যকে চিনতে হবে। এই দীর্ঘকালব্যাপী তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে দুঃখ দুর্দৈবের ভিতর দিয়ে গিয়েছে তার কাহিনী আমাদের জানতে হবে। নইলে ব্যাপারটা হবে এই : আমার যে বাল্যবন্ধু পঁচিশ বৎসর ধরে আমার অজানাতে অর্থাভাবে অনাহারে অল্পাহারে অকালবৃদ্ধ হয়ে হয়ে গিয়েছে, তাকে পথ মধ্যে হঠাৎ পেয়ে যতই না দরদী গলায় শুধোই, তবু শোনাবে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মত, 'হ্যাঁ রে, অ্যদ্দিন ধরে স্বাস্থ্যের কি অবহেলাটাই না করেছিস? একবার ঘুরে আয় না দার্জিলিং!' ঠিক তেমনি হবে, আজ যদি বাংলাদেশের কোনো সাহিত্যসেবীকে বলি, 'কি সায়েব, পঁচিশ বৎসর পাঞ্জাবীদের সঙ্গে দোস্তি দহরম মহরম করে বাঙলা ভাষাটাকে করলেন বেধড়ক অবহেলা। এইবারে শুরু করে দিন বাঙলার সেবা কোমর বেঁধে। গোটা দুই 'সাহিত্য পরিষদ' গড়ে তুলতে আর কমাস লাগবে আপনাদের? গোটা তিনেক 'দেশ'—একটাতে আপনাদের হবে না। আর আনন্দবাজারের বিক্রী সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারেন আপনারা তুড়ি মেরে। আপনাদের দেশ বিরাট, জনসংখ্যা এত্তের।'

পূর্বেই প্রশ্ন করেছি, পশ্চিম পাকে উর্দু কই? এটার উত্তর দফে দফে বয়ান করি।

পূব বাঙলার বেদনা আরম্ভ হয় পয়লাই জিন্না সায়েবকে নিয়ে। স্বাধীনতা পাওয়ার কয়েক মাস পরে তিনি স্বয়ং এলেন বাঙলাদেশে, ঐ "বেকার; বরবাদ" বাংলা ভাষা আন্দোলনকে ঠেকাবার জন্য—সেটি তখনো অঙ্কুরে। ঢাকার বুদ্ধিজীবীরা তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে করতে তাদের চক্ষু স্থির হতে স্থিরতর হতে লাগল। ভাষা বাবদে এ-হেন বেকুব (কটু বাক্যার্থে নয় : ওকীবহালের বিপরীত শব্দ বেকুবহাল বা বেকুব) তাঁরা উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে কস্মিনকালেও দেখেননি। বাংলা ভাষা ক্রমবিকাশের পথে কতখানি এগিয়ে গিয়েছে, বাংলা ভাষা কতখানি সমৃদ্ধ, ঐ ভাষা ও সাহিত্য দিয়েই পূব বাঙলার মুসলমানের হাড়মজ্জা মগজ হিয়া নির্মিত হয়েছে এবং এর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী মুসলমান এখন পূর্ণ যুবক—এ সম্বন্ধে জিন্নার কণামাত্র ধারণা নেই। তিনি ধরে নিয়েছেন, ভাষা ও সাহিত্য বাবদে বাঙালী মুসলমান ছমাসের শিশু : তাকে নিয়ে যদৃচ্ছ লোফালুফি করা যায়। তাঁর চোখের সামনে রয়েছে মার্কিন নিগ্রোদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, স্বয়ং জিন্নার এবং তাঁর পরিবারে ভাষা বাবদে কোনো প্রকারের পটভূমি বা ঐতিহ্যের ছিটেফোঁটাও নেই। তাঁর পরিবারের মাতৃভাষা কাঠিয়াওয়াড়ি—সে উপভাষা গুজরাতীর বিকৃত উপচ্ছায়া। তাঁর বাল্যকাল কাটে করাচীতে। সেখানকার ভাষা যদিও সিন্ধী তবু রাস্তাঘাটের ভাষা বহু ভাষা মিশ্রণে এক বিকট জগাখিচুড়ি। তদুপরি করাচীবাসী কাঠিওয়াড়ি গুজরাতী, খোজা, বোরা, মেমনরা পঠন-পাঠনে সিন্ধীকে পাত্তাই দেয় না। জিন্না ছেলেবেলা থেকেই তাই দেখে আসছেন এই বত্রিশ জাতের যে-কোনো ছেলেকে যে-কোনো ইস্কুলে পাঠিয়ে যে-কোনো ভাষা শেখানো যায়। যে-রকম কলকাতার যে-কোনো মারওয়াড়ি বাচ্চাকে তামিল ইস্কুলে পাঠিয়ে দিব্য তামিলাদি শেখানো যায়। ভাষাগত ঐতিহ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ছবি এহেন পরিস্থিতিতে জিন্নার চোখের সামনে ফুটে উঠবে কি করে? সর্বোপরি তিনি বুদ্ধিমান; কিশোর বয়সেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছিলেন, তাঁর ভবিষ্যৎ যে ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত সে ভাষা ইংরিজি। তিনি মনপ্রাণ ওতেই ঢেলে দিয়েছিলেন এবং সে ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেবেলায় করাচীর আর পাঁচটা মুসলমান ছেলের মত তাঁরও খানিকটে উর্দু শেখার কথা। কিন্তু তিনি কট্টর শীয়া, খোজা পরিবারের ছেলে। উর্দুর প্রতি খোজাদের কোনো চিত্তদৌর্বল্য নেই। কাজেই বলতে পারিনে ছেলেবেলায় অন্তত কিছুটা উর্দু শিখেছিলেন কিনা। তাঁর পরিণত বয়স কাটে বোম্বাইয়ে। বলা বাহুল্য, কি করাচী, কি বোম্বাই উভয় জায়গারই উর্দু সাতিশয় খাজামার্কা।

বেতার মারফত তাঁর একটি উর্দু ভাষণ আমি শুনি পাকিস্তান-জন্মের পর। সেটা শুনে আমি এমনই হতবুদ্ধি বিমূঢ় হই যে, আমি তখন শেল্-শক্-খাওয়া সেপাইয়ের মত নিজের আপন মাতৃভাষা ভুলে যাই, সে-হেন অবস্থায় এমনেজিয়া অর্থাৎ আচম্বিতে স্মৃতিভ্রংশতা রোগে। শেষটায় বিস্ময় বোধ হয়েছিল, যে লোক এতখানি ইংরিজি শিখতে পেরেছেন তিনি মাত্র ছমাস চেষ্টা দিলেই তো অল্পায়াসে নাতিভদ্র চলনসই উর্দু শিখে নিতে পারেন। ইনি এই উর্দু নিয়ে উর্দুর প্রপাগান্ডা করলে বাঙলা-প্রেমী মাত্রই বলবে, "উর্দু এ-দেশে চালানোর বিপক্ষে আরেকটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।' উর্দুপ্রেমী পশ্চিমা পূববীয়া উভয়ই তখন লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন।

ঢাকা, সিলেট সর্বত্রই তাঁর উর্দু ভাষণের ফল হল বিপরীত।

ঢাকা, সিলেটের লোক অত্যুত্তম উর্দু জানে না, মেনে নিচ্ছি। পাঠক, রাগ করো না, আমি যদি ধরে নি, তুমি অক্সফোর্ডের ইংরিজি অধ্যাপকের মত সর্বোচ্চাঙ্গের ইংরিজি জানো না; কিন্তু যদি ধরে নি, তুমি এ-দেশের ক্লাস সিক্সের ছোকরার ইংরিজি আর অক্সফোর্ড অধ্যাপকের ইংরিজিতে তারতম্য করতে পারো না তবে নিশ্চয়ই তুমি উষ্মাভরে গোসসা করবে। ন্যায়ত, ধর্মত॥

উভয় বাংলা—বর্বরস্য পূর্বরাগ

পূর্ব পাক পশ্চিম পাকের কলহ যখন প্রায় তার চরমে পৌঁচেছে তখন পশ্চিম পাকের জনৈক তীক্ষ্ণদ্রষ্টা বলেছিলেন, 'আমি পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূব পাক পশ্চিম পাক দুই উইংই দেখেছি কিন্তু গোটা পাখিটাকে এখনো দেখতে পাইনি।

এরই সঙ্গে একই ওজনে তাল মিলিয়ে আরেকটি পরস্পর-বিরোধী নিত্য ব্যবহারযোগ্য প্রবাদপ্রায় তত্ত্বটি বলা যেতে পারে :

'উভয় পাকেরই রাষ্ট্রভাষা উর্দু। কোনো পাকেই, এমন কি পশ্চিম পাকেরও কোনো প্রদেশবাসীর মাতৃভাষা উর্দু নয়।'

পাঠকমাত্রই অন্তত বিস্মিত হবেন। কথাটা গুছিয়ে বলার প্রয়োজন আছে।

পশ্চিম পাকের চারটি প্রদেশের বেলুচিস্তানের ভাষা বেলুচ, ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের ভাষা পশতু (বা পখতু), সিন্ধু প্রদেশের ভাষা সিন্ধী। সিন্ধী ভাষা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ধারণ করে।

বেলুচ ও পশতু ভাষায় ছাপা বই বা/এবং পাণ্ডুলিপি শতাধিক হবে না। কারণ এর অধিকাংশই আছে, লোকগীতি। শুধুমাত্র লোকগীতি দিয়ে একটা সম্পূর্ণ সাহিত্য তৈরী হয় না। এবং এগুলোও ছাপা হয়েছিল ইংরেজি নৃতত্ত্ববিদঘ্যাঁষা অফিসারগণ দ্বারা—কৌতূহলের সামগ্রী রূপে। মধ্য ও উচ্চ শিক্ষিত বেলুচ, পশতুভাষী পাঠান এগুলোকে অবহেলা করে, বেশীর ভাগ এসব সঙ্কলনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অচেতন। নিতান্ত পাঠশালার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ুয়া পড়ে কিনা বলতে পারবো না। আমাদের বটতলার সঙ্গে এদের কোনো তুলনাই হয় না। বটতলা শতগুণ বৈচিত্রধারী ও সহস্রগুণ জনপ্রিয়।

তাই ফ্রন্টিয়ার বেলুচিস্তানের নিম্ন ও মধ্য স্তরের রাজকার্য ব্যবসাদি হয় উর্দুতে। সেই কারণে উভয় প্রদেশের মাতৃভাষা উর্দু, এ-বাক্য বদ্ধ উন্মাদও বলবে না। পাঠানকে শুধু প্রশ্নটি মাত্র শুধোলে তার মাতৃভাষা উর্দু কি না সে রীতিমত অপমানিত বোধ করবে, মোকা পেলে রাইফেল তুলবে। বেলুচের বেলাও মোটামুটি তাই। তবে বেলুচ জাত অপেক্ষাকৃত নম্র এবং শান্ত। লোকমুখে শুনেছি ১৯৭১ সালে পূব বাঙলায় যে পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল তাতে পাঞ্জাবী পাঠানের তুলনায় বেলুচরা ছিল অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ। পশ্চিম পাক বর্বরতার প্রধান পুরোহিত টিক্কা খান একবার বা একাধিকবার বেলুচিস্তানে শান্ত জনতার উপর প্লেন থেকে বোমা ফেলেছিলেন বলে তিনি লোকমুখে যে উপাধি পান সেটা টিক্কাজাতীয় অফিসারকুলের পক্ষে সাতিশয় শ্লাঘার খেতাব—'বমার (বম্বার) অব বেলুচিস্তান'। পরবর্তীকালে বাঙলাদেশে তিনি পান লক্ষগুণে উচ্চ পর্যায়ের খেতাব 'বুচার অব বেঙ্গল'।

এ-ছাড়া বেলুচিস্তানের একটা ক্ষুদ্র অংশের লোক ব্রুহি উপভাষা বলে থাকে। ভাষাটি জাতে দ্রাবিড়। সুদূর দ্রাবিড়ভূমি থেকে এ ভাষার একটা পকেট এখানে গড়ে উঠলো কি করে এ নিয়ে ভাষাবিদরা এখনো মাথা ঘামাচ্ছেন। এরা উর্দু শেখে ঢাকাবাসীর চেয়েও শতাংশের একাংশ।

সিন্ধীদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভাষা বিকশিত, সাহিত্য সমৃদ্ধ। উত্তর ভারতের উর্দুর সঙ্গে সে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। তাই উর্দু শেখার জন্য তারা কখনো কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি—নিতান্ত কয়েকজন মোল্লা মৌলভী ছাড়া এবং যেহেতু বহুকাল পূর্বে আরবদের সঙ্গে সিন্ধুবাসীর সমুদ্রপথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ও ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধী ভাষা সোজাসুজি বিস্তর আরবী শব্দ গ্রহণ করেছিল (পক্ষান্তরে উর্দু তার তাবৎ আরবী শব্দ গ্রহণ করেছে ফারসী মারফৎ, অতএব কিছুটা বিকৃতরূপে) তাই মোল্লামৌলবীরাও উর্দুর নামে অযথা বে-এক্তেয়ার হতেন না—গুজরাতী, মারাঠী, এমন কি কোনো কোনো বাঙালী মুসলমান যে রকম হয়ে থাকেন।

আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, নাতিবৃহৎ পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর ঐ সিন্ধীরাই একমাত্র ভদ্র, বিদগ্ধ আপন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি।

এই যে ১৯৭১ নয় মাস ব্যাপী পশ্চিম পাকের সেপাই অফিসার রাজকর্মচারী পূব বাঙলাকে ধর্ষণ করে গেল, এর ভিতরে কোনো সিন্ধী ছিল বলে আমি শুনিনি। বিস্তর পূর্ববঙ্গবাসীদের আমি এ প্রশ্ন শুধানোর পরও। বস্তুত গত পঁচিশ বৎসর ধরে আমি প্রায়ই রাজশাহী, ঢাকা, সিলেট, চাটগাঁ, যশোর, খুলনা গিয়েছি কিন্তু কোনো সিন্ধী আর্মি অফিসার দূরে থাক, ছোট বা বড় কোনো চাকুরের সঙ্গে পরিচয়তক হয় নি। পূব বাঙলাকে সিন্ধীরা কস্মিনকালেও কলোনির মত শোষণ করেনি।

সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল এবং এখনো আছে পাঞ্জাবীরা।

ব্যত্যয় নিশ্চয়ই আছে, তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলবো, এ-রকম তথাকথিত শিক্ষিত অথচ বর্বর জাত বহুদেশ ভ্রমণ করার পরও আমি কোথাও দেখিনি।

এদের সবাই বলবে তাদের মাতৃভাষা উর্দু। বরঞ্চ আমি যদি বলি আমার মাতৃভাষা ঋগ্বেদের ভাষা, তবু আমি ওদের চেয়ে সত্যের অনেক কাছাকাছি থাকবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উর্দু ভাষা জন্মগ্রহণ করে উত্তর প্রদেশের আগ্রা ও তার সংলগ্ন দিল্লীতে। ঐ সময়কার পাঞ্জাবের বৃহৎ নগর লাহোর বা অমৃতসর উর্দুর কোনো সেবা করেনি। এবং এস্থলে এ তথ্যটাও স্মরণ করয়ে দেওয়া উচিত যে উর্দুতে হরিয়ানা অঞ্চলের দিল্লীর প্রাধান্য, সেটা রাজধানী ছিল বলে। সর্বোত্তম উর্দু এখনো উত্তর প্রদেশের মলিহাবাদ অঞ্চলে উচ্চারিত হয় এবং সাহিত্য গড়ে উঠেছে দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌয়ের প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার ফলে। পরবর্তীকালে এলাহাবাদ উর্দুর অন্যতম পীঠভূমি হয়ে দাঁড়ায় এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পিতামহ উর্দু সাহিত্যের যে সেবা করে গিয়েছেন সেটা অবিস্মরণীয়।

উর্দু জন্ম নেয় উত্তর প্রদেশের প্রাকৃত মায়ের কোলে। পাঞ্জাবে যে প্রাকৃত প্রচলিত সে এ-প্রাকৃতের অনেক দূরের। লাহোর অঞ্চলে সে প্রাকৃতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে ডাকতে হয়। সিলেটী বাঙলা এবং রাঢ়ের বাঙলা একই প্রাকৃত থেকে। তাই সিলেটী উপভাষা সাধু বা চলিত বাঙলার ডায়লেক্ট। লাহোরের আচণ্ডাল নিজেদের মধ্যে যে 'পাঞ্জাবী' বুলিতে কথা বলে সেটা উর্দুর ডায়লেক্ট নয়।

লাহোর অমৃতসর অঞ্চলগত প্রাকৃতের প্রকৃত মূল্য দিয়েছিলেন মাত্র একটি মহাজন। উত্তর প্রদেশে যে যুগে হিন্দী রীতিমত উন্নত সাহিত্য ধারণ করতো, উর্দুর ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সেই যুগে আমাদের এই মহাত্মা এসব কিছু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আপন পাঞ্জাবের প্রাকৃত দৃঢ়ভূমির উপর নির্মাণ করলেন অজরামর 'গ্রন্থসাহেব'।

তাবৎ পাঞ্জাবভূমি, পাকিস্তানী পাঞ্জাব হিন্দুস্থানী পাঞ্জাব সব মিলিয়ে দেখি যে এখানে মাত্র একটি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আছে। শিখ সম্প্রদায়। আপন মাতৃভাষায় রচিত হয়েছে তাদের শাস্ত্রগ্রন্থ। শুনে বিস্মিত হয়েছি, শিখদের প্রতি বিরূপ বাদশা ঔরঙ্গজেব নাকি 'গ্রন্থসাহেব' থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন।

মোদ্দা কথা : পশ্চিম পাঞ্জাববাসীর মাতৃভাষা উর্দু তো নয়ই, তাদের মধ্যে যে ভাষায় কথাবার্তা হয় সেটা উর্দুর ডায়লেকট্‌ও নয়। অর্থাৎ তাদের 'মাতৃভাষা' এখনো সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠেনি। বরঞ্চ মার্কিন নীগ্রোদের অবস্থা ঢের ভালো, ইংরিজি ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা বা উপভাষা তারা আদৌ জানে না, নিজেদের মধ্যেও ইংরিজি বলে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, মাতৃভাষাহীন সদম্ভস্ফীত, অজ্ঞতামদমত্ত এই একটা বর্বর জাত রাজত্ব করার ছলে শোষণ করতে এসেছিল পূব বাঙলায় এমন একটা জাতকে যার ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, সে সাহিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছে নোবেল প্রতিষ্ঠান যাকে বিশ্বস্বীকৃতিও বলা যায়॥

উভয় বাঙলা—পুস্তকসেতুভঙ্গ

বঙ্গভূমিতে যদি কস্মিনকালেও সংস্কৃতের কোনো চর্চা না থাকতো, তবে আজ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষ করে গদ্য-সাহিত্য, নিশ্চয়ই এতখানি বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারতো না। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র হয়ে হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সর্ব গদ্য লেখকই অত্যুত্তম সংস্কৃত জানতেন এবং ঐ সাহিত্য থেকে কী যে গ্রহণ করেন নি, তার নির্ঘন্ট দেওয়া বরং সোজা। বস্তুত এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকও মধ্যম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীর সংস্কৃত জানতেন। এবং একালেও একাধিক সাহিত্যিক অনায়াসে সংস্কৃতের অধ্যাপক হতে পারেন। এবং বঙ্গসাহিত্যসেবী সংস্কৃত অধ্যাপকদের কথা তোলাই বাহুল্য। সংস্কৃতের সাহায্য না নিয়ে বাঙলা গদ্যের ক্রমবিকাশ আমরা কল্পনাই করতে পারিনে।

উর্দু ঠিক সেই রকম নির্ভর করেছে প্রধানত অতিশয় সমৃদ্ধ ফার্সী সাহিত্য ও অল্পবিস্তর আরবীর উপর। তাই উর্দুর লীলাভূমি উত্তরপ্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি মাদ্রাসা বহুকালের ঐতিহ্য নিয়ে, ও প্রধানত ধর্ম ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা ও শিক্ষাদান করেছে। এদের আরবী ফার্সী চর্চা উর্দুর জন্মকাল থেকে সে-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে। মাইকেল যেরকম অত্যুত্তম সংস্কৃত জানতেন, গালিবও তদবৎ উচ্চাঙ্গের ফার্সী জানতেন। এমন কি পাঞ্জাবের সবে-ধন নীলমণি কবি ইকবালও ফার্সী দিয়ে আপন ঈষৎ কষ্টসাধ্য উর্দুকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

কিন্তু তাবৎ পাঞ্জাবের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি, এমন কি যে লাহোর পাঠান মোগল আমল থেকে সমৃদ্ধশালিনী নগরী, পাঞ্জাবের মুকুটমণি, মুসলমানদের সংখ্যাগুরুত্ব যেখানে অন্যান্য সম্প্রদায়কে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল সেখানেও কস্মিনকালেও পূর্ণাঙ্গ একটি মাদ্রাসা ছিল না—উর্দুকে রসদ-খোরাক যোগাবার জন্য, কারণ পূর্বেই বলেছি, পাঞ্জাবীর মাতৃভাষা উর্দু নয়। পার্টিশেনের সঙ্গে সঙ্গে যে-সব মৌলবী মৌলানা উত্তর প্রদেশ থেকে শরণার্থীরূপে লাহোর পৌছলেন তাঁরা লাহোরের মাদ্রাসাটি দেখে বিস্ময়ে নৈরাশ্যে মূক হয়ে গেলেন। তুলনা দিয়ে বোঝাতে গেলে বলি, সে-মাদ্রাসাটি ক্লাস সিকস অবধি পড়াতে পারে, অর্থাৎ মাইনর স্কুলের মত মাইনর মাদ্রাসা! সম্পূর্ণ অবান্তর নয়, তাই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করি, পাঞ্জাবের তুলনায় যদিও পূব বাঙলা অতিশয় দীন, তবু সেই পূব বাঙলাতেই আছে, বহুকাল ধরে তিনটি পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসা—ফের তুলনা দিয়ে বলি, পি এচ ডি মান পর্যন্ত! ওদিকে মাইনর স্কুল এদিকে ডকটরেট! মাদ্রাসার সিকস অবধি কতখানি ইসলামী শাস্ত্রচর্চা হওয়া সম্ভবে! উর্দুর সেবাই বা করবে কতখানি? তারই ফলে পাঞ্জাবীদের কোনো দিক দিয়ে কোনো প্রকারের বৈদগ্ধ্যের ঐতিহ্য নেই।

তারই দ্বিতীয় বিষময় ফল, যে-পাঞ্জাবে মাদ্রাসার অভাবে শাস্ত্রীয় ইসলামের কোনো আবহাওয়া নেই সেখানকার পাঞ্জাবী সিভিল, মিলিটারি অফিসাররা, তিনটে সমৃদ্ধশালী মাদ্রাসা এবং অগুণিত মাইনর মাদ্রাসার উপর দণ্ডায়মান, ইসলামী আবহাওয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত পূব বাঙলায় এসে দম্ভভরে সর্বত্র দাবড়াতে দাবড়াতে প্রচার করতে লাগল, তারাই পাক-ভারতের ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বোত্তম মুসলমান, পূব বাঙলার মুসলমানরা মেরে কেটে আধা মুসলমান,—কিংবা মুসলমানী নাম এরা ধরে বটে, কিন্তু আসলে কাফির! গত যুদ্ধের সময় পাঞ্জাবী পাঠান সেপাইদের লাহোর পেশাওয়ারে শেখানো হয়েছিল, "পূব পাক-এ মসজিদের ঢঙে নির্মিত এমারত দেখতে পাবে। সেগুলো একদা মসজিদ ছিল। পরবর্তীকালে ওদেশের লোক ইসলাম বর্জন করে, এবং বর্তমানে নমাজের অছিলা ধরে ভারতাগত কাফের এজেন্টদের সঙ্গে ঐ সব এমারতে মিলিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করে।"

এ-সব তথ্য তত্ত্ব আমার মূল বক্তব্যের পক্ষে কিছুটা অবান্তর কিন্তু এগুলো থেকে বিশেষ করে হিন্দু পাঠকের বিস্ময় কথঞ্চিৎ প্রশমিত হতে পারে—মুসলমান সেপাই কি করে তাদেরও ধর্মালয় মসজিদে ঢুকে নামাজরত তাদের ধর্মভ্রাতা নিষ্ঠাবান মুসলমানদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেশিনগান চালিয়ে মারলো? নিশ্চয়ই কলকাতার বিস্তর হিন্দু স্বচক্ষে দেখেছেন পাঠান, পাঞ্জাবী, কাবুলী, বাঙালী সর্বদেশের মুসলমান চিৎপুরের একই নাখুদা মসজিদে ঢুকছে।

কিন্তু আমার মূল বক্তব্য : পূব বাঙলায় পশ্চিম বাঙলার বই ব্যান হল কি ভাবে? তার অবতরণিকাতেই যদি বলি, লাহোরের ঐ যে ক্ষুদে মাদ্রাসাটি লিক লিক করছিল, সে-ই এ-লড়াইয়ের পয়লা বুলেট ফায়ার করেছিল, তবে বাঙালী পাঠকমাত্রই বিস্মিত হবেন, সন্দেহ কি!

উত্তর প্রদেশ থেকে লাহোরাগত মৌলবী মৌলানারা নিজের স্বার্থেই হোক—মাইনর মাদ্রাসার তনখা তাঁদের পক্ষে হাস্যাস্পদ—কিংবা ইসলামী চর্চা উচ্চতর পর্যায়ে তোলার জন্যই হোক, তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন পুঁচকে ঐ মাদ্রাসাটিকে উচ্চমানে তোলার জন্য।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক কোথায়? এ-স্থলে স্মরণে আনি, সুইটজারল্যান্ড দেশের বের্ন শহরে সর্বপৃথিবীর লেখকদের স্বার্থ রক্ষার্থে সমাগত বিভিন্ন দেশ কপিরাইট সম্পর্কে কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল, যে-সব দেশ এসব আইনে (সংক্ষেপে বের্ন কনভেনশন) দস্তখত দেবেন তাঁরা একে অন্যের কপিরাইট মেনে চলবেন। যেমন কোনো ভারতীয় প্রকাশক বিনানুমতিতে গত মাসে লন্ডনে প্রকাশিত, সর্বস্বত্বরক্ষিত কোনো পুস্তক ছাপতে পারবেন না। কত বৎসর পরে মূলগ্রন্থ, কত বৎসর পরে তার অনুবাদ বিনানুমতিতে ছাপতে পারা যায়, সে-বিষয়ে মূল আইনকে কিঞ্চিৎ সীমাবদ্ধ, প্রসারিত, সংশোধিত করা হয়েছে।

পাকিস্তান বের্ন কনভেনশনের মেম্বার হল না। বাংলাদেশ হয়েছে কিনা জানিনে।

তার কারণ অতি সরল। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু বই না হলে পাঞ্জাবের চলে না। সেগুলো ছাপা হয় ভারতে, কপিরাইট ভারতীয় লেখকের। কাঁড়ি কাঁড়ি ফরেন কারেনসি চলে যায় ভারতে, ওগুলো কিনতে গিয়ে। সে-বইগুলো যাতে নির্বিঘ্নে, ভারতীয়দের কোনো প্রকারের রয়েলটি না দিয়ে লাহোরে ছাপানো যায় সেই মতলব নিয়ে পাকিস্তান বের্ন কনভেনশনের মেম্বার হয় নি।

কিন্তু বললেই তো আর হয় না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, লাহোর কোনোকালেই উর্দুর পীঠস্থান ছিল না। তাই ফাউন্ডারি ছাপাখানা, কাগজ নির্মাণ, প্রুফ রীডার ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো রকমের জিনিস এবং মানুষ লাহোরে আছে অতি অতি অল্প, বহু বস্তু আদৌ ছিল না। এগুলো তো আর রাতারাতি গড়ে তোলা যায় না।

ঢাকাও সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপদেই পড়লো। কিন্তু লাহোরের তুলনায় সে কিছুই নয়। কারণ ঢাকার ভাষা বাংলা, সাহিত্য বাংলা। লাহোরে বাস করে যদি একজন উর্দু লেখক, তবে ঢাকায় অন্তত দশজন বাঙলা লেখক। বর্ধমান যেমন কলকাতার আওতায় ছিল, ঢাকাও তাই ছিল। লাহোর সেরকম উর্দুভূমির আওতায় কোনো কালেই ছিল না। গোড়ার দিকে ঢাকার কুমতলব ছিল না, বের্ন কনভেনশনের পুটাশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ফাঁকি দিয়ে তাদের বই ছাপানো। তাদের প্রধান শিরঃপীড়া ছিল, আপন পাঠ্যপুস্তক রচনা করা; ছাপানো ইত্যাদি। তদুপরি পাঠ্যপুস্তকে প্রবন্ধ কবিতা সঞ্চয়নে ঢাকার ভাবনা অনেক কম। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, মাইকেল, হেমচন্দ্র ইত্যাদি বিস্তর ক্লাসিক লেখকের কপিরাইট ততদিনে শেষ হয়ে গিয়েছে কিংবা যাবো যাবো করছে। বের্ন থাক আর না-ই থাক—ঢাকা তার পাঠ্যপুস্তকে এঁদের লেখা তুলে ধরলেই তো যথেষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত না-ই বা থাকলেন শরৎচন্দ্র বা তারাশঙ্কর। উঠে পড়ে লেগে গেল ঢাকা—পিছনে কবি, গল্পলেখক অসংখ্য না হলেও নগণ্য নয়, তদুপরি ঢাকা বিরাট পূর্বপাকের রাজধানী। লাহোর পশ্চিম পাকের রাজধানী তো নয়ই, যে-পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধান নগর সেও তেমন কিছু বিরাট প্রদেশ নয়।

লাহোর কোনো উন্নতি করছে পারছে না দেখে তাকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে উৎসাহিত করার জন্য এক ঝটকায় ব্যান করে দেওয়া হল তাবৎ ভারতীয় পুস্তকের আমদানী। পাঞ্জাবী কর্তাদের অনুরোধে করাচীর বড় কর্তারা অবশ্য ব্যান করার সময় ভেবেছিলেন উর্দু বইয়ের কথা। কিন্তু ফাঁদে পড়ে গেল পশ্চিম বাংলার বইও। অর্ডারটা অবশ্য খুব খোলাখুলি দেওয়া হয়েছিল কিনা জানিনে।

কিন্তু সেটা ফাঁস হয়ে গেল সেই যে ছোট্ট মাদ্রাসাটির কল্যাণে। তারা পড়লো সমূহ বিপদে। তাদের আরবী ফার্সী পাঠ্যপুস্তক ছাপবার জন্য আরবী অক্ষরের ফাউন্ডারি, প্রেস, প্রুফরীডার কোথায়? যে উত্তর প্রদেশের সর্বোচ্চ মাদ্রাসাদ্বয় প্রচুর আরবী বই কিনতো সেই উত্তর প্রদেশে মাড় একটি আরবী প্রেসের নাম সর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। "নওলকিশোর প্রেসের" মালিক ছিলেন আরবী-ফার্সী-উর্দুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল জনৈক হিন্দু। এ-অধম শৈশবে ঈশ্বর নওলকিশোরের ছাপা পুরাণ দিয়েই পাঠারম্ভ করে। খুদ মক্কাশরীফে একদা তাঁরই কুরান বিক্রী হত।

আরবী পুস্তক ব্যান করার বিরুদ্ধে মোল্লারা করলেন তীব্র প্রতিবাদ। সেটা প্রকাশিত হল এক উর্দু সাপ্তাহিক-এ। করাচীর ইংরিজি "ডন" করলো সেটার অনুবাদ। সেটা খবর হিসেবে প্রকাশিত হল কলকাতায়। তখন আমরা জানতে পারলুম, পশ্চিম বাংলার বই কেন ঢাকা যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে জুট চা একসপ্লয়েটকারী লাহোরের চা-ব্যবসায়ীরা চিন্তা করছে, পূব বাঙলার বুক-মার্কেট কিভাবে একসপ্লয়েট করা যায়। সে-ও এক মজাদার কেচ্ছা।

উভয় বঙ্গে—আধুনিক গদ্য কবিতা

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পাঠক গদ্য কবিতা (গবিতা ও গবি বিপ্রকর্ষণ অসৌজন্যবশত নয়) সম্বন্ধে সবিশেষ কৌতূহলী না হলেও গবিকুল ও তাঁদের চক্র যে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে গবিতা রচনা করেন, সাপ্তাহিক রবিবাসরীয় ছয়লাপে ভাসিয়ে দেন, সর্ববিধ ব্যঙ্গ কৌতুক চরম অবহেলাসহ উপেক্ষা করে এলিয়ট, পাউন্ড নিয়ে গভীর আলোচনা, তুমুল তর্কবির্তকে মত্ত হন, এ-সব গ্র্যান্ড মাস্টারদের গবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন এবং বহু ক্ষেত্রে কষ্টার্জিত কার্যাপণ ব্যয় করে ওইসব মহামূল্যবান রত্নরাজি রসিক বেরসিক সকলের সামনে তুলে ধরেন, এসব কাণ্ডকারখানা দেখে সবিস্ময়ে মন ধায় একাধিক সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করে তুলনীয় একটা বিরাট আন্দোলন আবিষ্কার করতে। বহুতর প্রচেষ্টার পর দেখি, পঞ্জিকার ভাষায় "সর্বদিকে যাত্রা নাস্তি"। বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় ঝাঁকে ঝাঁকে কবি জমায়েত হতেন, গজনীর মাহমুদ বাদশা ধনদৌলত লুট করার সময় দুচারটে কবি লুট করতে কুণ্ঠিত হতেন না, মঙ্গোলদের সর্বনাশা দিগ্বিজয়ের ফলে হাজার দুত্তিন ইরানী কবি মোগল দরবারে আশ্রয় পান। একসঙ্গে একই দরবারে দু—ই তি—ন হাজার কবি। তৎসত্ত্বেও পরিষ্কার দেখতে পাই, এঁরা স্থায়ী অস্থায়ী কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকার আন্দোলনের সূত্রপাতটুকু পর্যন্ত করতে পারলেন না। পক্ষান্তরে এই দীন পশ্চিমবঙ্গ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, পাঠক-সাধারণ কর্তৃক অবহেলিত গবিকুল কী প্রচণ্ড তেজে নয়া এক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তস্মাৎ প্রণমা-প্রণিধায় কায়ং। অতিশয় সত্য যে "ন তৎসমোৎস্তৎ ভ্যধিকঃ কুতোৎনো।"

বাঙলাদেশেও একই হাল। হয়তো পরিসংখ্যা বৃহত্তর। তবে তাঁদের চক্রটির পরিধি কতখানি বিস্তৃত সেটা জরীপ করা সুকঠিন কর্ম। অবশ্য এ-কথা অতীব সত্য, ঢাকার অসংখ্য দৈনিকের প্রায় সব কটিই রবিবাসরীয় তথা সাহিত্য সংখ্যায় ভুরি ভুরি গবিতা ছাপে। যে কটি বিখ্যাত অখ্যাত গবির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা, গবিতার তরে কলিজার খুন দিয়ে শহীদ হবার জোশ পশ্চিমবঙ্গের গবিকুলকে দস্তুরমত ভেল্কিবাজি দেখাতে পারে। পূর্ববাঙলার বাজারে পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক মাসিকের নিদারুণ অনটন সত্ত্বেও ঢাকার গবি সম্প্রদায় এ-বাঙলার গবিদের নাম জানেন, ও একাধিকজনের রচনা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন, এঁদের সম্বন্ধে তত্ত্ব ও তথ্য সহ উচ্চাঙ্গের আলোচনা করতে পারেন এবং সহৃদয় পরিবেশ পেলে করেও থাকেন। এঁদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে তাঁরা আমাদের মত গবিতাউদাসী এবং যাঁরা আগাপাস্তলা গবিতাবৈরী "কাফের" তাঁদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য অবলম্বনে একাধিক গবির ন্যায় "তাচ্ছিল্যি" প্রকাশ প্রায় করেনই না এবং আমরা যে নিতান্তই হতভাগ্য গৈবলানন্দ থেকে বঞ্চিত, অশিক্ষিত জড়ভরত সে কথা আভাসে ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়েও দেন না। কলকাতা ফিরে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলুম, এ-বঙ্গের একাধিক গবিও ও-বাঙলার বেশকিছু গবি সম্বন্ধে ওকীবহাল এবং আশ্চর্যের বিষয় নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ও-বাঙলার গবিতার বই বেশ কিছু পরিমাণে এ-দেশে এসে পৌঁচেছে। আমার মনে হয়, কথাসাহিত্যের জনপ্রিয়তা স্মরণে রাখলে দেখা যাবে, গবিতার ন্যায্য হিসেবে যা পড়ার কথা তার চেয়ে ঢের বেশী গাব্য পুস্তিকা দুই বাঙলাই পাচার ও লেনদেন করেছে। অবশ্য গবিতার প্রতি কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন বিশ্বনিন্দুকরা বলে, এই গদ্য কবিতা বিনিময় নির্ভেজাল গাব্য রসাসক্তি বশত নয়, এর মূল কারণ অন্যত্র ও সন্তর্পণে লুক্কায়িত। উভয় বঙ্গের গবিকুলের অনেকেই কমুনিস্ট এবং তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাব বিনিময় লেনদেনের সময় গবিতা-রস এপিটাইজিং ফাউ রূপে এস্তেমাল করেন।

বাঙলাদেশের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক গবিদের এ-বাঙলার অনেকেই চেনেন—আমাদের মত অপাংক্তেয় অরসিকদেরও দুএকজন। কবি আবুল হোসেনের শিক্ষা-দীক্ষা কলকাতায়। দেশ বিভাগের পূর্বেই তাঁর প্রতিভা উভয় বাঙলার অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাষার উপর দখল, স্পর্শকাতর হৃদয় দিয়ে বিষয়বস্তু চয়ন, অনাড়ম্বর পদ্ধতিতে সৃষ্টরস পরিবেশন তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই যেন আধা-আলোতে লুকিয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি দক্ষিণপূর্ব-এশিয়ায়। সে-যুদ্ধ তাঁর অন্যতম সঙ্কলনে প্রকাশ পেয়েছে। নয়টি মাসের ইয়েহিয়া নৃত্য কিন্তু এখনো তাঁকে নব সৃষ্টির জন্য তাড়না লাগাতে পারেনি। কিংবা হয়তো তাঁর পিতার অকারণ, মর্মান্তিক পরলোকগমন তাঁর চৈতন্যলোকে ট্রাউমা হয়ে সেখানে সর্বরসধারা আসুরিক পদ্ধতিতে রুদ্ধ করে দিয়েছে। আশা রাখি, এ-ট্রাউমা দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির প্রতি পূর্ণ উদাসীন, আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতা খবর পেয়েছিলেন যে খানসেনা তাঁদের গ্রামে প্রবেশ করছে। হয়তো ভেবেছিলেন—সেইটেই স্বাভাবিক—সর্বপ্রকারে রাজনৈতিক কর্মে সম্পূর্ণ অক্ষম এই অথর্ব বৃদ্ধের প্রতি কি খানসেনা, কি লীগ এমন কি পেশাদার খুনী গুণ্ডারও বৈরীভাব পোষণ করার মত কোনো স্বার্থ, দ্বেষ বা অন্য হেতু থাকতে পারে না। গ্রামের সদর রাস্তা দিয়ে মার্চ করে যাবার সময় খানরা তাঁকে দেখতে পেল বৈঠকখানায়। বাক্যব্যয় না করে তাঁকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারে।

আবুল হোসেনের সমসাময়িক আরো উত্তম উত্তম কবি আছেন। তাঁদের পরবর্তীকালের রচনা হাতে আসেনি—যোগাযোগ ছিল না বলে।

সর্বাধুনিক গবিদের ভিতর বাহ্যত কিশোরসম, আমার তথা সর্ব বয়স্কজনের স্নেহের পাত্র মিঞা শম্‌সর্ রহমানের রচনা সরল ও সরস, ছত্রে ছত্রে যেন নতুন নতুন ডাক দিয়ে যায় বাঁকে বাঁকে, দেখায় অপ্রত্যাশিত বিচিত্র ছবি; যদিও একাধিকবার আমার মনের কোণে জেগেছে একটি ধারণা : মিঞা শমস্-এর গবিতার বিষয়বস্তু এত বেশী রোমান্টিক যে এগুলো সাবেক পদ্ধতির কবিতায়—চিত্রাঙ্কন একাডেমিক স্টাইল নামে যে টেকনিক পরিচিত—রচিত হলে তাঁর বিচিত্র অনুভূতি সুডৌল নিটোল রূপে ব্যাপকতর আত্মপ্রকাশ করতে পারতো।

মননশীল প্রবন্ধ, বিশেষত সাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক তথা পূর্ববঙ্গীয় লেখিকাদের সৃষ্টি নিয়ে তাঁর রচনা কয়েক বৎসর পূর্বেই বানু সালমা চৌধুরীকে তথাকার সাহিত্য জগতে সম্মানের আসন দিয়েছিল। সম্প্রতি তিনি একখানি চটি গবিতা পুস্তিকা প্রকাশ করে ইতিমধ্যেই তাঁর সৃষ্টির বহুমুখীধারা, বহুবিচিত্র বিদগ্ধ তথা জ্ঞানপদ শব্দ চয়নদ্বারা সমৃদ্ধ ভাষা ও শৈলী, ঐতিহাসিক নয় মাসের বিভীষিকাময়ী সুদীর্ঘ লক্ষ যামা করাল রজনী, সর্বোপরি লেখিকার আম্মা, নানী, বৃদ্ধা মাতৃসমা পরিচারিকাটির ভিন্নেৎসহ আচারনিষ্ঠ, শান্ত, নম্র পঞ্চোপাসনান্তে লব্ধ অবকাশে নিত্যচারু-কলারত একটি মুসলমান পরিবারের যে-চিত্রটি লেখিকা দরদী হৃদয় দিয়ে এবং প্রধানত ব্যঞ্জন ও সুনিপুণ পরিচালনা দ্বারা অঙ্কন করেছেন, সে-ছবিটির বৈচিত্র্যগুণ রসগ্রাহীজনের সপ্রশংস চিত্তাকর্ষণ করেছে। বস্তুত সদ্য প্রস্ফুটিত বুদ্ধিবৃত্তি তথা নীতি-বিকশিত স্পর্শকাতরতাসহ কিশোরীর প্রাগুক্ত সাহিত্যিক রচনার চেয়েও।

লেখিকার বড় মাসীর সূফীতত্ত্বমূলক মা(১) রিফতী গীতি (মিস্টিক্ সঙ্‌স্) তাঁর অকালমৃত্যুর পর জনগণের স্বীকৃতি লাভ করেও ঢাকা বেতার কয়েক বৎসর ধরে তাঁর সূফী পল্লীগীতি প্রচার করে আসছে। এই মাসীর কনিষ্ঠপুত্র, লেখিকার অগ্রজ অক্লান্ত সাহিত্যসেবী, ভগ্নীর প্রতি সদা স্নেহশীল মরহুম অলির কাছ থেকে লেখিকা সাহিত্যের যাত্রাপথে পদাপর্ণের প্রথম উষাকাল থেকে অকুণ্ঠ উৎসাহ ও সর্বাধিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। অতিশয় নিরীহ, সত্যার্থে বিরলতম এই অজাতশত্রু অলিভাইকে খানরা গুলি করে মারে তাদের বর্বর অভিযানের সঙ্গে সঙ্গেই—চট্টগ্রামে। শোকাতুর লেখিকা তাঁর জনপদ কল্যাণী মাসীকে স্মরণে এনে অশ্রুসিক্ত নয়নে পুস্তিকাটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রিয় দাদাভাই সাহিত্যসখা অলিকে। কবিতাগুচ্ছের অনেকগুলিই অশ্রুশিশিরে সিক্ত।

---

(১) সামলা চৌধুরী, "অংশীদার আমি", সিলেট, ১৩৭৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতাধিক বৎসর পূর্বে এই চট্টগ্রামেরই আরেক নারী, রহিম্মুন্নেসা তার ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে কাতর হৃদয় বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিল :*

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বার বার,
মোর জাদু চলি গেল ফিরিল না আর।

উভয় বাঙলা—সদাই হাতে দড়ি, সদাই চাঁদ

গত শতকের শেষের দিকে, এবং এ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ চিন্তামগ্ন ভারতবর্ষকে আর কোন্ কোন্ দ্রব্যে শোষণ করা যায়। একাধিক চতুর লোকের মাথায় খেলল বাঙলা মুলুকের মাছ। মৎস্যের প্রতি যে বাৎসল্য বাঙালীর আছে, সে রকম উদাহরণ পৃথিবীর কোনো জাতের কোনো বস্তুর প্রতি আছে কি না সেটি গভীর গবেষণার বিষয়। অতএব ভারত সরকারের পুরো মদদ, পুলিসের কড়া শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় দুই ইংরেজ মাছের ব্যবসা খুলতে গেল, দুটি কলের জাহাজ নিয়ে। কথিত আছে অস্মদেশীয় নমস্য ভেড়িওয়ালারা (শব্দটি আমি হরি, জ্ঞান রাজ কারো অভিধানে পাইনি—মৎস্য উৎপাদনকারী অর্থে যে অর্থে অর্বাচীন লেখক এ-স্থলে সভয়ে ব্যবহার করছে) মহরতের পূর্বরাত্রে দুটি জাহাজ পুড়িয়ে দিলেন পুলিসকে বিশেষ অঙ্গুলি প্রদর্শন করত এবং সরকারকে উভয় হস্তের। অতঃপর আবার ইংরেজ চেষ্টা দিলে "দুশমনদের" আওতার বাইরে চিল্কা হ্রদে। কথিত আছে, সর্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার প্রাক্কালে কে বা কাহারা চিল্কাপারের সরকারী বিশ্রামাগারে গভীর নিশীথে একাধিক ইংরেজ হনু মৎস্য ব্যবসায়ীকে পেঁদিয়ে লম্বা করে দিয়ে যায়। অবশ্য ভেড়িওয়ালাদের এহেন অপ্রশংনীয় আচরণের মধ্যে অন্তত একটি প্রশংসনীয় "ভদ্রস্ততা" ছিল : উভয় প্রচেষ্টার প্রারম্ভেই তাঁরা গোরারায়দের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ ধরনের প্রচেষ্টা তাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নাও হতে পারে....অর্বাচীন বঙ্গীয় ইতিহাসে এর চেয়ে বিস্ময়জনক ঘটনা আমার জানা নেই; কোথায় তখন "স্বদেশী", ক্ষুদিরাম, গান্ধী—ইংরেজের সেই দোর্দণ্ডতম প্রতাপের মধ্যাহ্নে? যদি অনুমতি পাই তবে নির্ভয়ে নিবেদন, কম্যুনিজম ফ্যাসিজম সাংখ্যবেদান্ত মাকালী মৌলা আলি এঁদের কারোরই প্রতি আমার অখণ্ড বিশ্বাস নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে নিবেদন আমার সাতিশয় অবিচল দৃঢ়তম বিশ্বাস, ভারত এবং কিংবা বাঙলা সরকার এমন কি প্রয়োজন হলে বাঙলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে মৎস্য রপ্তানির আশ্বাসে বলীয়ান হলেও তাঁরা কস্মিনকালেও আমাদের ভেড়িওয়ালাদের আয়ত্তে এনে মৎস্য মূল্য ভদ্রজনোচিত স্তরে আনতে পারবেন না, না, না। নিতান্তই যদি শিলা জলে ভেসে যায় ধরনের অসম্ভব কল্পনাবিলাস করতেই হয়, তবে বলি, যদি কখনো পারেন, তবে সেই সন্ধ্যায়ই ভারতের তাবৎ ট্রেড ইউনিয়ন করায়ত্ত হবে, আহমদাবাদী, অন্যান্য কোটিপতি তথা কালোবাজারীরা পড়িমরি হয়ে কিউ লাগাবেন গত পঞ্চাশ বছরের ঠকানো ইনকাম ট্যাক্স শোধ করতে, যাবতীয় কার্টেল মনপলিকে নিধন করতে সরকারের এক মাসও লাগবে না, গরীব চাষাকে দাদন দিয়ে তার সর্বনাশ সাধনরত সট্টাবাজার—এক কথায় এমন কোনো সংগঠনই তখন নির্বিঘ্নে আপন অসামাজিক আচরণে লিপ্ত থাকতে পারবে না। ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ না করেও সাধারণ পর্যটকের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমাদের ভেড়িওয়ালাদের ঐক্য ও তজ্জনিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তির সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় সমন্বিত শক্তি আমি কোথাও দেখিনি, পড়িনি, শুনিনি। ঈশ্বর তাঁদের মঙ্গল করুন এবং আমাকে যেন পরজন্মে ভেড়িওয়ালাকুলে স্থান দেন।

বোহরা, খোজা তথা পাঞ্জাবীরা যখন পূব বাঙলার পাট, চা, চামড়া থেকে আরম্ভ করে বিদেশীর সহায়তায় নির্মিত আলপিন তক তার মারফত তাদের রসাল কলনিটির আঁটিতে কামড়াতে আরম্ভ করেছেন তখন কতিপয় উদ্যোগী পাঞ্জাববাসীর মনে একটি অতিশয় মৌলিক অভিযানচিন্তা উদিত হল। "পূরব্ পাকিস্তানের মর্দ-লোগ তো বটেই ঔরৎলোগভী বহুৎ বহুৎ কিতাব পড়ছে। এই কিতাব-মার্কেটটাকে যদি কব্জাতে আনা যায় তবে কুল্লে পাকিস্তানে যে বাইশটি পরিবার দেশের অধিকাংশ ধনদৌলতের মালিক আমরা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারব"। মাছের বেলা যে রকম ইংরেজ উদ্যোগী পুরুষদের পশ্চাতে আপন সরকার দাঁড়িয়েছিল তাদেরই বা মদদ দেবে না কেন পিণ্ডি-ইসলামাবাদ? পূর্ববঙ্গে তখন পুস্তকোৎপাদনে ভেড়ি দূরে থাক, কটা এঁদোপুকুর ছিল, এক আঙ্গুলে গুনে বলা যেত।

ব্যাপারটার গোড়াপত্তন কিন্তু এক নূতন পরিস্থিতি এবং তারই ফলে এক নূতন প্রয়োজনীয়তা থেকে। পূব বাঙলাকে যথারীতি শাসনশোষণ করার জন্য পশ্চিম পাক বিশেষত পাঞ্জাব থেকে নিরবচ্ছিন্ন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পর্যায়ের কর্মচারী পাঠাতে হলে মুশকিল এই যে তারা "ন-পাক" বাঙলা ভাষাটার সঙ্গে মোটেই পরিচিত নয় এবং যতদিন না সে ভাষা সম্পূর্ণ লোপ পায়—সে পুণ্যকর্ম করার জন্য সরকার অবশ্যই সদা জাগ্রত ও যত্নবান—ততদিন এদের তো কাজ চালাবার মত বাঙলা শিখতে হবে। ওদিকে কলেজের ছাত্ররাও হৃদয়ঙ্গম করেছে, সিন্ধী বেলুচী বা পশতু শিখে বিশেষ কোনো লাভ নেই। সিন্ধু দেশে তো যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত সিন্ধীজন আছেই, তদুপরি অর্ধবর্বর পাঠান-ভূমি, বেলুচিস্থান এমন কি সিন্ধু প্রদেশ পূব পাকিস্তানের তুলনায় এতই ক্ষুদ্র যে সেখানে চাকরির সংখ্যা অতি অল্প। এবং এ কথাও সত্য বেলুচ পাঠানের উপর ডাণ্ডা চালানো অতটা সহজ নয়। বেলুচিস্তানের উপর তো পরবর্তী কালের "বুচার অব বেঙ্গল" টিক্কা খান বোমা ফেলে "বমার অব বেলুচিস্তান" খেতাব পেয়েছেন—পূব বাঙলার উপর এখনো বোমা ফেলতে হয়নি। অতএব শেখো বাঙলা—প্রেমসে। করাচী, লাহোর এমন কি যে পাঠানের মাতৃভাষা পশতু, বলতে গেলে এখনো যে ভাষা লিখতে রূপ পায়নি, সেই পাঠান উঠে পড়ে লেগে গেল পেশাওয়ার বিদ্যালয়ে বাঙলা শিখতে।

এ বড় মজার পরিস্থিতি। খুদ পশ্চিম পাকে বাঙলা শেখা হচ্ছে পূর্ণোদ্যমে, আর সেই বাঙলা ভাষাকে নিধন করার জন্য পূব পাকে গোপনে প্রকাশ্যে দমন নীতির সঙ্গে সঙ্গে আইনকানুনও নির্মিত হল। তারই একটা ফরমান সম্পূর্ণ বেআইনী কায়দায় ঘোষণা করলো, পূব বাঙলা এলাকায় পশ্চিম বাঙলার জীবিত কি মৃত—মৃত লেখকের কপিরাইট তামাদি হয়ে গিয়ে থাকলেও—কোনো লেখকের বই ছাপানো চলবে না এবং পশ্চিম বাঙলার প্রথম প্রকাশিত যে কোনো বই পূব বাঙলায় ছাপানো যাবে না। এর ফলে পূব পাকিস্তানের অধ্যাপক ও কবি জসীম উদ্দীনের কাব্য "নক্সি কাঁথার মাঠ" ইত্যাদি পূব বাঙলায় ছাপানো নিষিদ্ধ হল কিনা স্মরণে আসছে না; কবির তাবৎ পুস্তকই তো কলকাতার ছাপাখানাতেই জন্ম নেয়, প্রথম প্রকাশ তো সেখানেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিমবঙ্গের লেখকমণ্ডলী নিশ্চয়ই এ ব্যানের সংবাদ শুনে উল্লাস বোধ করতেন যদি তখন সেটা জানতে পেতেন। বিশেষ করে নীহার গুপ্তর মত জনপ্রিয়, শঙ্করের মত বহুদর্শী ও সমরেশের মত নির্ভীক লেখক নিশ্চয়ই এ সংবাদ শুনে কথঞ্চিৎ শান্ত হতেন, কারণ কালোবাজারের চোরাই সংস্করণের এঁরাই ছিলেন শিকারের প্রধান প্রধান বাঘসিঙি। কিন্তু ইত গজটা এখনো বলা হয়নি। পশ্চিম বাঙলার বই পূব পাকিস্তানে ছাপানো ব্যান্ হল বটে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ছাপানো ব্যান হল না।

কি কারণে কার স্বার্থে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পাঞ্জাবের উদ্যোগী পুরুষসিংহরা—যদিও সিংহগুলো কালোবাজারী পুস্তক ছাপানোর অনৈসর্গিক ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত—যাতে করে পূব বাঙলার বুক-মার্কেট পরিপূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারেন। বিধি বলুন, বিজ্ঞান বলুন তিনি/তাঁরা এঁদের প্রতি অকস্মাৎ সদয় হলেন। ফোটো-ফ্ল্যাশ নামক পদ্ধতি ততদিনে আবিষ্কৃত হয়েছে—যার প্রসাদে সরাসরি যে-কোনো বই সস্তায় পুনমুর্দ্রণ করা যায়—নতুন করে কম্পোজ প্রুফরীডিং ইত্যাদির ঝামেলা পোয়াতে হয় না। প্রাগুক্ত পশ্চিম পাকের বাঙলাভাষা অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য এঁরা সর্বপ্রথম ছাপলেন তাঁদের বাঙলা পাঠ্যপুস্তক ব্যাকরণ ও অভিধান। চট্‌সে প্রকাশিত হল চলন্তিকা। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ পশ্চিম পাকে বই বিক্রি হবে অল্প, পূব পাকের ভূমাতে শাস্ত্রসম্মত সুখম। ওদিকে উল্লেখ প্রয়োজন পশ্চিম পাক থেকে পূব পাক যে কোনো বই উর্দু হোক বাঙলা হোক, যে কোনো পরিমাণে আমদানি করতে পারে—তার উপর কোনো ব্যান্ নেই। কাজেই পাঞ্জাবী উদ্যোগীরা ছাপতে লাগলেন, শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বটতলা পর্যন্ত। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কালে বা তার কিঞ্চিৎ পূর্বে কলকাতায় প্রকাশিত গীতাঞ্জলির একটি শোভন পকেট সংস্করণেরও অত্যুত্তম ফোটোফ্ল্যাশ সংস্করণ তাঁরা বাজারে ছেড়েছিলেন। সকণ্ঠে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলি, "গুণিজনের মনোরঞ্জনার্থে"! বাজারটা কিন্তু খুব বেশী দিন বাঁচলো না। ইতিমধ্যে লেগে গেল ১৯৬৫র লড়াই। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় একাধিক প্রকাশক "দুশমন মুল্লুকের তামাম মাল হালাল" অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত এই অছিলায় বেধড়ক ছাপতে শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রকারের পুস্তক। ইতিপূর্বে যে আদৌ করেননি তাও নয়। মি. ব্ল্যাক অনুচর স্মিথও অপাংক্তেয় রইলেন না।...পূব পাক স্বাধীন হওয়ার পর এখনো কি পরিমাণ "পাইরেটেড" মুদ্রণের প্রচার ও প্রসার আছে তার অনুসন্ধান করিনি।

কী অদ্ভুত পরস্পর-বিরোধী পলিটিকস চালালে চব্বিশ বছর ধরে পশ্চিম পাকের দণ্ডধরগণ। পূব বাঙলায় পলিসি ছিল তার সাহিত্য ও ভাষার যথাসাধ্য বিনাশ করা এবং দ্বিতীয়ত পূব বাঙলা যেন পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে কি সাহিত্যে কি সঙ্গীতে কোনো প্রকারের যোগসূত্র রক্ষা করতে না পারে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকে হবে বাঙলা বড় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের জন্য ছাপতে দিল বাঙলা বই অভিধান। ওদিকে কলনি শোষণনীতি অনুসরণ করে পশ্চিম বাঙলায় প্রাকশিত পুস্তক পাঞ্জাবে যদৃচ্ছ ছাপতে ও পূব বাঙলায় বে-লাগাম বিক্রয় করতে বাধা দিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্তর বিদগ্ধ পাঠক স্বভাবতই শুধোবেন, ইকবাল? ইকবাল তো পাঞ্জাবী? কবি হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি আছে। তা হলে পশ্চিম পাঞ্জাবীদের সঙ্গে উর্দুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, বলা যায় কি প্রকারে? তুলনা দিয়ে বলা যায়, জোসেফ কনরাডের মাতৃভাষা ছিল পোলিশ। তিনি ইংরিজিতে সাহিত্য সৃষ্টি করে বিখ্যাত হয়েছেন। তাই বলে পোল্যান্ডবাসীর সঙ্গে ইংরিজির অন্তরঙ্গতা আছে, এ কথা বলা যায় না।

হেমচন্দ্রের স্থান বাঙলা সাহিত্যের কোন শ্রেণীর আসনে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বাক্যবিন্যাস করার অধিকার এ অর্বাচীন লেখকের আছে; আমার বিস্তর পাঠকের প্রভূত পরিমাণে থাকার কথা। কিন্তু উর্দু কাব্যের সঙ্গে আমার পরিচয় এতই সীমাবদ্ধ যে সে কাব্যে ইকবালের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করবার মত কাব্যাধিকার আমার অত্যল্পের চেয়েও কম। তথাপি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধশ্রেণীকে সাধ্যানুযায়ী পূর্ণতর করার উদ্দেশ্যে সেটা অবর্জনীয়।

ইকবাল, আমার যতদূর জানা আছে, জর্মন কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—খুব সম্ভব ম্যুনিক থেকে—দর্শন বিভাগে ডক্টরেট পান। কোনো কোনো পাঠকের কৃপাধন্য এ গর্দভও দর্শন বিভাগ থেকে ডক্টরেট পায়—জর্মনির অন্যতম বিখ্যাত বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং বললে পেত্যয় যাবেন নিশ্চিৎ মত্তুল্য এবং "মদাপেক্ষা" সহস্রগুণে খঞ্জতর ভূরি ভূরি গর্দভ গর্দভী জর্মনি থেকে—জর্মনি কেন, সর্বদেশেই—নিত্যি নিত্যি ডক্টরেট পেয়েছে ও পাবে। অতএব ইকবাল 'ভক্ত' মদোৎকট পঞ্চনদবাসী কবি ইকবালের ডক্টরেট নিয়ে যতই ধানাই পানাই করুক, ঢক্কা-ডিণ্ডিম-নাদ ছাড়ুক, তদ্দ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়ার কারণ নেই। বিশেষত আমরা যখন বিলক্ষণ অবগত আছি, উচ্চাঙ্গের কাব্য রচনার জন্য দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন নেই, এবং ঐ উদ্দেশ্যে ম্যুনিক পানে ধাবমান হওয়াও বন্ধ্যাগমন। বস্তুত কবি ইকবালের ঢক্কাবাদক পঞ্চনদ সম্প্রদায় তাঁর যে-সব "দার্শনিক কবিতা"। প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ সেগুলি না দর্শন না কবিতা। অবশ্য আমার এই ধারণার মূল্য নাও থাকতে পারে। তাঁর বিশেষ ধরনের কবিপ্রতিভা ছিল, সে তথ্য সুবিদিত।

ইকবাল যে-সব কবিতায় অতীতের মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টির গুণ-কীর্তন করেছেন এবং তাঁর যুগে মুসলিম জাহানের সর্বত্র সে-সভ্যতা ও কৃষ্টির অস্তমিত অবস্থার যে কারণ বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলোই সবচেয়ে জনপ্রিয়। ইতিহাসের দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখলে সেগুলিতে ভুল-ত্রুটি নগণ্য এবং স্থলে স্থলে কবিজনসুলভ অতিশয়োক্তি নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য।

এক-এক জলজন্তু পর্বতপ্রমাণ।
সাগর করিবে গ্রাস হয় অনুমান॥

যে সাগরে জলজন্তু বাস করে সেই গোটা সাগরকে যদি সেই জলজন্তু গ্রাস করতে পারে তবে ইউক্লিডের মুখে ছাই দিয়ে স্বীকার করবো, কোনো বস্তুর খণ্ডিত অংশ সেই বস্তু থেকে বৃহত্তর হতে পারে! কিন্তু কাব্য বিজ্ঞান নয়, দর্শনও নয়। যদিও আলঙ্কারিক দণ্ডিন তাঁর "'কাব্যাদর্শে" মত প্রকাশ করেছেন, এ-জাতীয় অসম্ভাব্য বর্জনীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একতায় হিন্দুরাজগণ
সুখেতে আছিল সর্বজন
সে ভাবে থাকিত যদি
পার হয়ে সিন্ধু নদী
আসিতে কি পারিত যবন?

রঙ্গলাল বঙ্গভূমে একদা এই শ্লোক ছন্দে প্রকাশ করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ইকবালের শোকপ্রকাশশৈলী অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের। কিন্তু যে মুসলিম কৃষ্টির ন্যায্য প্রশস্তি ইকবালের কাব্যে আছে তাতে পাঞ্জাবী মুসলিমদের "অবদান" সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন কি না, আমার মনে পড়ছে না। তবে এ কথা স্পষ্ট মনে আছে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় প্রতি বৎসর একটা জব্বর ডিবেট হয়। বিষয় : "কে শ্রেষ্ঠতর কবি?—ইকবাল না গালিব?" এবং পাঞ্জাবীরা একদা দলে ভারি থাকতো বলে ডিবেট শেষের ভোট-মারে গালিব প্রতি বৎসর মার খেতেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সত্যই কবিতা কিনা, এ নিয়ে যাঁরা বক্তৃতা দেন কবি স্বয়ং তাঁদের নিয়ে মস্করা করেছেন। তদুপরি তাঁর কিংবা কোনো কবির কাব্য থেকে পছন্দমত, যেটা লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়কে সাহায্য করে সেটা গ্রহণ, যেটা করে না সেটা বর্জন করে করে কবির জীবনদর্শন নির্মাণ করাটা তিনি নেকনজরে দেখতেন কিনা, রসিকজন দেখেন কিনা, সে বিষয়ে আমি শঙ্কা পোষণ করি। ইকবাল যখন গাইলেন, "চীন ও আরব আমাদের হিন্দুস্থান আমাদের" তখন এই 'আমাদের'-এর আমরা খুব সম্ভব একমাত্র মুসলমানগণ, কারণ চীন ও আরবে হিন্দু আছেন বলে শুনিনি। পক্ষান্তরে তিনি যখন বলেন "হিন্দুস্থান সর্ব বিশ্বে শ্রেষ্ঠতম" তখন নিশ্চয়ই তিনি আপন মাতৃভূমিকে (সে যুগে ভারত ইসলামের জন্মভূমি আরবের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আসন দিচ্ছেন। অতএব তিনি প্রথম মুসলিম তারপর ভারতীয়, না প্রথম ভারতীয় তারপর মুসলিম এ-সমস্যা থেকেই যায়—অন্তত আমার কাছে। সর্বশেষ প্রশ্ন, দেশ, ধর্ম, ভগবান ইত্যাদির প্রতি রচিত কবিতা আজ পর্যন্ত বিশ্বকাব্যে কতখানি সফল হয়েছে, কোন পর্যায়ে উঠতে পেরেছে, সেটাও পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন।

রঙ্গলালের কবিতা বাঙালীকে অকস্মাৎ যবনবৈরী করে তুলেছিল বলে কখনো শুনি নি; ইকবালের কাব্য পাঞ্জাবী মুসলমানকে তার স্বধর্ম সম্বন্ধে শ্লাঘা অনুভব করতে সাহায্য করলো। এটা প্রশংসনীয়। কিন্তু এই স্বধর্মাভিমান যখন অন্য ধর্মকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে এমন কি বৈরী ভাবে দেখতে আরম্ভ করে—বিশেষ করে পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার পর—তখন প্রতিবেশী ভারতীয় হিন্দুর প্রতি পাঞ্জাবীদের রাজনৈতিক আচরণও যে বৈরীভাবাপন্ন হবে সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক। এমন কি পাঞ্জাবে প্রচলিত ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের পাঞ্জাবী মুসলিমও নিপীড়িত হয়। তবে এর মূলে আছেন ইকবাল—এ অপবাদ আমি কখনো শুনিনি।

দেশ বিভাগের পর পাঞ্জাবীদের ভিতর দেখা দিল দুই প্রকারের আত্মম্ভরিতা। পাকিস্তান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র অতএব পাকিস্তানীরা বিশ্ব মুসলিমের প্রতিভূ, এবং যেহেতু তাঁরা প্রতিভূ, অতএব তাঁরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান; বলা বাহুল্য সেই সর্বশ্রেষ্ঠদের মুকুটমণি স্বভাবতই, অতি অবশ্যই পাঞ্জাবী মুসলমান। সূত্রটি সত্য কিন্তু তার থেকে যে দুতিনটি সিদ্ধান্ত হল সেগুলো যুক্তি ও ইতিহাসসম্মত নয়। কামাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতাতুর্ক স্বদেশ তুর্কীর কর্ণধার হওয়ার পূর্বে সে দেশের সুলতান ছিলেন বিশ্ব মুসলিমের অধিনায়ক—খলিফা। তুর্কীর বর্তমান অধিবাসী সংখ্যা চার কোটির মত। খলিফার আমলে মোটামুটি ঐ ছিল। সেকালে একাধিক দেশে ঢের ঢের বেশী মুসলমান বাস করতেন। আর সংখ্যাগুরুত্বই যদি সর্বক্ষেত্রে স্পর্শমণি বা কষ্টিপাথর হয় তবে পাকিস্তানীরা খলিফার শূন্য আসনে তাদের রাষ্ট্রজনক জিন্নাসাহেব, বা পরে জাতভাই পাঞ্জাবী গুলাম মহম্মদ কিংবা মদ্যপ লম্পট ইয়েহিয়াকে বসালে না কেন? অক্সফোর্ডের অধ্যাপক সংখ্যা ৮৭০, ছাত্র ৬৯০০; মার্কিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংখ্যা ২১৭৪, ছাত্র ১০২৩৮। (এই অধ্যাপক-ছাত্র-শুমারী ১৯৫০-১৯৫২-এর) তারই জেরে হার্ভার্ড তো কখনো প্রাধান্য বা তার ছাত্রাধ্যাপক অক্সফোর্ডের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এমনতরো দাবি করেনি! মানুষের মাথা একটা, সে-মাথাতে যদি উকুন থাকে তবে সে-উকুন অসংখ্য।

পাঞ্জাবী মুসলমানরা পাক-ভারতে শ্রেষ্ঠ—সর্বশ্রেষ্ঠ না—যোদ্ধা হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। পঞ্চাশাধিক বৎসর ধরে আমি সিভিল মিলিটারি উভয় শ্রেণীর পাঞ্জাবীকে চিনি এবং কস্মিনকালেও এই খ্যাতিতে বিশ্বাস করিনি। ইয়োরোপের বিখ্যাত যোদ্ধা য়ুঙ্কের (JUNKER) গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এবং তাদের এক পরিবারে বেশ কিছুকাল আমি বাস করেছি, ফরাসী অফিসারদের স্যাঁ সীর মিলিটারি অ্যাকাডেমির কয়েকজনকে আমি চিনতুম, এক ইংরেজ কর্নেলের কাছে প্র্যাকটিসহীন পুস্তকে সীমাবদ্ধ অ্যামেচার রণনীতিতে আমার হাতেখড়ি হয়, আফগান অফিসারদের চিনতুম ঝাঁকে ঝাঁকে, আমারই এক ছাত্র বাচ্চা-ই-সকওয়ের "আ র্মি তে" হয়ে গিয়েছিল রাতারাতি "কর্নেইল" এবং এই সর্বাঙ্গ গোষ্ঠীর ভিতর সবচেয়ে দুর্দান্ত "ডাকু" অফিসার ছিল জারের ফৌজে—ডুয়েল লড়া সামান্য অসম্মানে আত্মহত্যা করাটা যাদের ছিল নিত্যদিনের তুচ্ছ আচরণ। মত্তাবস্থায় শেষরাত্রে অন্ধকার ঘরে চেয়ার টেবিলের আড়াল থেকে একজন ডাকলে 'কু—উ—উ', অন্যজন ছুঁড়বে সেদিকে পিস্তলের গুলি, এটা যাদের সর্বপ্রিয় খেলা (!) রাস্‌পাতিনহন্তা গ্র্যান্ড ডিউক ইউসপফ এদেরি একজন—এদের কয়েকজনকেও ভালো করেই চিনতুম।

যে নাৎসিরা ইহুদীদের পাইকারী হারে খুন করে, তাদের সঙ্গে সনাতন আর্মির কোনো যোগ ছিল বলে শুনিনি—ব্যত্যয়গুলো অন্যান্য অফিসার কর্তৃক তীব্রকণ্ঠে তিরস্কৃত হয়েছে, যাদের ছিল তারা হিটলারের স্বহস্তে নির্মিত নাৎসি পার্টির সদস্য দ্বারা গঠিত, হিটলারের নিজস্ব আর্মি এস এস—ব্ল্যাক কোট পরিহিত। কি সনাতন আর্মি, কি এস এস কেউই ধর্ষণকর্মে লিপ্ত হয়নি। ন্যুরেনবের্গ মোকদ্দমায় অপরাধের দফাওয়ারি যে ফিরিস্তি পেশ করা হয় সেটাতে ধর্ষণ নেই।

ইয়েহিয়ার একাধিক সেপাই দ্বারা পর পর ধর্ষিতা অগণিত নারী সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেছে। অফিসারদের জন্য প্রতি কেন্টুনমেন্টে নির্মিত হয়েছিল ব্রথেল—অনেক মেয়েকেই লুঠ করে আনা হয়েছিল মেয়ে-বোর্ডিং থেকে। ঢাকাস্থ সাধারণ পাঞ্জাবী সেপাই ঢাকার সামান্য বাইরে মুক্তি ফৌজের ভয়ে এমনই মুক্ত-পাজামা হয়ে গিয়েছিল যে আমার নিকটতম "সৈয়দ" আত্মজনকে অনুরোধ করতো, তারা যেন আল্লার কাছে প্রার্থনা করে ওদের যেন মফঃস্বলে বদলি না করা হয়। এবং পরাজয় অনিবার্য জানামাত্রই অফিসার গোষ্ঠী প্রাইভেটদের না জানিয়ে প্লেন, হেলিকপ্টার, লঞ্চ চুরি করে পালায়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগুলোর অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন ছিল আহত খান সৈন্যদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য। এদের আমি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলি কি করে?

উভয় বাঙলা—"হুজ্জৎ-ই-বাঙ্গাল"

"হুজ্জৎ" কথাটা ন-সিকে খাঁটি আরবী এবং অর্থ "যুক্তি", "আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তি", "আপত্তি প্রকাশ করণ" ইত্যাদি। শব্দটির কোনো কদর্থ আরবীতে আছে বলে আমার জানা নেই। ইরানবাসীরা যখন শব্দটি তাদের ভাষা ফার্সীতে গ্রহণ করলো তখন তার স্বাভাবিক অর্থ তো রইলই, উপরন্তু শব্দটির একটা কদর্থ গড়ে উঠতে লাগলো। মানুষের স্বভাব এই যে, সে বিপক্ষের যুক্তিতর্ক স্বীকার করতে চায় না। তদুপরি বিপক্ষ যদি নিছক "যুক্তি" ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারের বিবেচনা না দেখায়, যেমন ধরুন প্রমাণ করা গেল যে, সমাজে বিশেষ কোনো রীতি বা অনুষ্ঠান বহুকাল ধরে বিনা আপত্তিতে সর্বজনগ্রাহ্য, এমন কি সম্মানিত হয়েছে, যদ্যপি সে রীতি যুক্তিবিরুদ্ধ—এবং তখনো সে বারংবার একই যুক্তির দোহাই দিতে থাকে, তবে মানুষ স্বভাবতই বিরক্ত হয় এবং ব্যঙ্গ করে তাকে তর্কবাগীশের স্থলে "তর্কবালিশ", "দ্বন্দ্বপ্রিয়", "ঝগড়াটে" ইত্যাদি কটুবাক্যে পরিচয় দেয়। এবং মানুষের এই স্বভাবই তখন কটু থেকে কটুতর হতে হতে মূল "যুক্তি" (হুজ্জৎ) শব্দটাকে "অযথা তর্ক", "ভণ্ডাচরণের অজুহাত" কদর্থেও ব্যবহার করতে থাকে। বাঙলা এই শব্দটা ফার্সী থেকে গ্রহণ করার সময় এটাকে 'অহেতুক তর্কাতর্কি" অর্থে নেওয়ার দরুণ সেটার ওই "ঝগড়াটে" অর্থটাই জনপ্রিয় হয়ে গেল। তাই কবি হেমচন্দ্র বাঙালি মেয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে রচেছেন "হুজ্জতে হারিলে কেঁদে, পাড়া করে জয়"।

এর সব কটা অর্থই আমি মেনে নিয়েছি, কিন্তু বাঙালি কোষকারগণ যদিও "হুজ্জুতে" বলতে প্রধানত "কলহপ্রিয়" অর্থেই ধরে নিয়েছেন তবু বহুক্ষেত্রে যেখানে "হুজ্জুৎ" শব্দ ব্যবহার হয়েছে এবং হয় তার বাতাবরণ, পূর্বপর, প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে আমার মনে হয়েছে, শব্দটার অর্থ "ঝগড়াটের" চেয়ে ঢের ঢের ব্যাপকতর। কোন স্থলে মনে হয়েছে এর অর্থ "জেদী" "একগুঁয়ে" "অবস্টিনেট" "দুর্দমনীয়", "কিছুতেই বশ মানতে চায় না"। মূল আরবীতে লেখারম্ভে নিবেদন করেছি, শব্দটার একটা অর্থ আপত্তি প্রকাশ করা এবং "দৃঢ় কণ্ঠে মতদ্বৈধ প্রকাশ করা"। সরল বাংলায় সহজ অর্থ "বিদ্রোহ করা", দীর্ঘতর অর্থ "অন্যান্য দাবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা"।

হুতোম যখন তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় নকশাতে একটি ফার্সীপ্রবাদ আংশিক অনুবাদ করে লিখলেন "সাধারণ কথায় বলেন, 'হুনরে চীন' ও 'হুজ্জুতে বাঙ্গাল' তখন তিনি "হুজ্জুতে" কি বুঝেছিলেন বলতে পারবো না, কারণ এই তুলনাহীন গ্রন্থখানার লেখক শ্রীতালাহুল ব্ল্যাক ইয়ারের অনুগত তাবেদার মোসাহেব এ-অধম সে-গ্রন্থখানা বটতলা থেকে শুরু করে অনবদ্য শোভন সংস্করণ পর্যন্ত কতবার যে কিনেছে এবং তার কাছ থেকে কতবার ধারের ছলে চুরি হয়েছে সে-কথা স্মরণে আনলেই সে তৎক্ষণাৎ পরশুরামের মত শপথ গ্রহণ করে, এই গৌড়ভূমিকে সে বারংবার নিষ্পুস্তক-চৌর করবে—আমৃত্যু, এবং জন্মনি জন্মনি, প্রতি জন্মে।...এ-স্থলে কিন্তু লক্ষণীয় প্রবাদটির ফার্সী মূলরূপ "হুনর্-ই-চীন ওয়া হুজ্জৎ-ই-বাঙ্গাল"। অস্যার্থ 'স্কিল অব চায়না অ্যান্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেবেঁলিয়াসনেস (অবসটিনেসি) অব বেঙ্গল'। কাজেই 'হুজ্জৎই-ই-বাঙ্গাল'-এর মধ্যবর্তী 'ই'টি 'হুজ্জুতে'-এর একার হয়ে বিশেষণে পরিবর্তিত হয়নি, যে-রকম 'চাষাড়ে, ঝগড়াটে, তামাটে'। এ-স্থলে "—ই—" টির অর্থ অফ। যে রকম মরহুম ফজলুল হকের জনগণদত্ত উপাধি ছিল 'শের-ই-হিন্দ' 'টাইগার অব্ বেঙ্গল'। বাঙলায় লেখা হত 'শেরে হিন্দ'। এই সূক্ষ্ম ব্যাকরণগত পার্থক্য না করলেও অর্থ দাঁড়ায়, চীন বিখ্যাত তার নৈপুণ্যের জন্য, বঙ্গদেশ তার পৌনঃপুনিক বিরোধিতার (একগুঁয়েমির) জন্য। নীচ ইতর অর্থে না নিলে 'ঝগড়াটে'ও বলা যেতে পারে। শান্তস্বভাব বিদ্যাসাগর যবে থেকে বিধবা বিবাহের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, সেই থেকে বড্ড ঝগড়াটে হয়ে গেছেন বললে তো 'ঝগড়াটে' শব্দটি এ-স্থলে উচ্চাঙ্গের প্রশস্তিসূচক।

অথচ সত্যার্থে বাঙালি বিদ্রোহী নয়,—অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী অর্থে যদি সে-শব্দ ব্যবহার করা হয়। পুনরায় দ্রষ্টব্য, 'বিদ্রোহী' শব্দটি কে ব্যবহার করছে তার উপর এর সদর্থ, কদর্থ দুইই নির্ভর করছে। মাদজীনিকে ইতালির তৎকালীন 'সরকার', দ্য গল-কে ভিশি 'সরকার' বিদ্রোহী, দেশদ্রোহী পদবী দিয়ে জনসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা দিয়েছে। ঠিক ওই একই ভাবে কবে, কবেকার সেই গুপ্তযুগ থেকে যুগ যুগ ধরে বলা হয়েছে 'অতঃপর বঙ্গদেশ' 'বিদ্রোহ' করিল। পাঠান যুগে বঙ্গদেশ নিত্যনিয়ত বিদ্রোহ করে ব'লে দিল্লী সরকার দুটি শব্দে এদেশের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সে-শব্দদ্বয় আমি ভুলে গিয়েছি কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রতিবারে যে অখণ্ড শ্লাঘা অনুভব করেছি সেটা ভুলিনি এবং অর্থটাও ভুলিনি; মোটামুটি 'বিদ্রোহী জনপদ' "উৎপাত-ভূমি" "জঙ্গীস্থান" এই ধরনের কিছু একটা নিন্দাসূচক—অধম 'গুষ্টিসুদ্দু' সে-নিন্দা চন্দনের মত শ্রীরাধার অনুকরণে সর্বাঙ্গে অনুলেপন করেছে। কিন্তু গভীর বিস্ময় ও ঘৃণা অনুভব করেছি এবং এখনো করি, যখন দেখি পাঠান মোগল ইংরেজ ঐতিহাসিকের দোহার গেয়ে বাঙালি—আবার বলছি বাঙালি প্রখ্যাত বাঙালি—ঐতিহাসিক অসঙ্কোচে মাছিমারা কেরানীর মত পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি করেন, 'অতঃপর বঙ্গবাসী দিল্লীর বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করলো।' পাঠান মোগল ঐতিহাসিকের মুখে এহেন বাক্য স্বাভাবিক! তারা দিল্লীশ্বরের অনুগত দাস, দিল্লী সরকারের সঙ্গে তাদের একাত্মানুভূতি বিচিত্র নয়। কিন্তু বাঙালি ঐতিহাসিক আজ পর্যন্ত বাঙালির দৃষ্টিবিন্দু থেকে বরঞ্চ দৃঢ় প্রত্যয়সহ বলি বিশ্বমানবের দৃষ্টিকোণ থেকে এই 'বিদ্রোহটার' রেজোঁ দেৎর স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব হেতুটার অনুসন্ধান না করে নিন্দাসূচক 'বিদ্রোহ' শব্দটা প্রয়োগ করেন কেন?

বার্ধক্যজনিত ভারবহনক্ষম 'বিদ্রোহী' স্মৃতিদৌর্বল্যের উপর নির্ভর করে নিবেদন, বাদশা জাহাঁগির যখন শেষ 'বিদ্রোহী' বাঙালি পাঠানরাজ ওসমানকে আত্মসমর্পণ করার জন্য আদেশ পাঠালেন তখন ওসমান অতিশয় ভদ্রভাষায় উত্তরে যা লেখেন তার সারমর্ম : আপনি ভারতেশ্বর, আপনার রাজ্য সুবিস্তৃত, আপনার ক্ষমতা অসীম। আমি পড়ে আছি ভারতের এক কোণে। আমার স্বাধীনতা আপনার কোনো প্রকারের ক্ষতিসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। জঙ্গলের চিড়িয়াটাও স্বাধীন থাকতে চায়।

ওসমান বলতে চেয়েছিলেন, বনের পাখির স্বাধীনতা একান্তই স্বভাবজাত, নৈসর্গিক। সে-স্বাধীনতা কারো প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে না, পরধনলোভ সে-স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত স্বধর্ম নয়। কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষম সত্য প্রকাশ করেছেন যখন বললেন, আমি ভারতের এককোণে পড়ে আছি। তার পূর্ণ অর্থ কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্যজাতি তার সর্বপ্রাচীন আদিবাস কেন্দ্র থেকে নির্গত হয়ে উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সঠিক কোন্ জায়গায় এসে আর অগ্রসর হল না সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু পূর্বদিকে বঙ্গদেশই যে তার সর্বশেষ অভিযান সীমান্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পূর্বদিগন্তে বাঙলাই শেষ আর্যভাষা।

এ বঙ্গদেশ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা দ্বারা চিরকাল নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে আরাকান, দক্ষিণে সমুদ্র। অথচ পশ্চিম থেকে যুগ যুগ ধরে শক হূণ তুর্ক পাঠান মোগল ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে হানা দিয়েছে দলে দলে। তাদের চাপ পড়েছে পাঞ্জাবের উপর, সে-দেশের লোক চাপ দিয়েছে উত্তর প্রদেশের উপর—করে করে সর্বশেষ চাপ পড়েছে বাঙলার উপর। সে হতভাগা উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ কোনো দিকেই চাপ দিতে পারে না, পালাবার পথ পর্যন্ত তার নেই। সে তখন রুখে দাঁড়াবে না তো কি করবে? সেটা বিদ্রোহ নয়,—এমন কি সেটাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিলেও মোক্ষমতম তত্ত্বটি প্রকাশ পায় না। প্রতিবারেই তার রুখে দাঁড়ানোটা নিতান্তই, একান্তভাবে আপন জীবনরক্ষার্থে—ওসমানের সেই কোণ-ঠাসা ছোট্ট চিড়িয়াটিকে ধরতে গেলে সেও ঠোকর মারত। এ প্রচেষ্টাকে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' 'মুক্তিযুদ্ধ' 'দেশাত্মবোধজাত আত্মাহুতি' ইত্যাদি গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী সদৃশ উচ্চনামে ডাকুন আর নাই ডাকুন, ওটাকে কাশ্মীর কান্যকুব্জ পাঠান মোগল রাজন্যবর্গের মুখপাত্র হয়ে 'বিদ্রোহ' নাম নিয়ে স্পর্শকাতর জনকে বিড়ম্বিত করবেন না। বলা বাহুল্য সে পরাজিত হয়েছে একাধিকবার। সে তখন দেখেছে বিজয়ী 'বীরবৃন্দ' তার পুত্র-ভ্রাতাকে হত্যা করেছে, অবলাদের ধর্মনষ্ট করেছে, তার ক্ষেত ফসল কেড়ে নিয়েছে, তার শেষ রক্তবিন্দু শোষণ করার পর ক্রীতদাসরূপে তাকে বিদেশের হট্ট-পণ্যালয়ে নির্বাসিত করেছে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে হল বিলকুল একটা নয়া খেল। হঠাৎ কোথা থেকে হাজার হাজার বিহারী দারওয়ান, মিস্ত্রি বাবুর্চি ঢুকলো তাদের দেশে। এ-দেশ তারা যুদ্ধে জয় করে ঢুকলে সেটা অভূতপূর্ব অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হত না। তার উপর এল পাঞ্জাবী, পাঠান সুদূর পশ্চিম ভারত থেকে, খোজাবোর অতিদূর বোম্বাই করাচী থেকে। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে আসতে হলে এদের যুদ্ধে পরাজয় করতে হত প্রথম হরিয়ানা রাজধানী দিল্লী, তারপর উত্তরপ্রদেশ, তারপর বিহার, সর্বশেষ বঙ্গদেশ। এহেন স্ববীর্যে করায়ত্ত সমুদ্রে সেতু নির্মাণ না করে দুর্ধর্ষ রাবণ, ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ অজেয় জগতে বীরগণকে আত্মনাশা সর্বনাশা সংগ্রামে পর্যুদস্ত না করে হনুমান এক লম্ফে বসে গেলেন রাবণের রাজসিংহাসনে!

বিনা যুদ্ধে যারা এল, এরা এক একটা আস্ত হনুমান—অবশ্যই ভিন্নার্থে অর্থাৎ মর্কটার্থে। না, মাফ চাইছি। মর্কটকুলকে অপমান করতে যাব কেন আমি? ওরা যারা এসেছিল তাদের যা বর্বর আচরণ তারা দেখালে কোনো মর্কট তো কস্মিনকালেও সে-বর্বরতার সহস্র যোজন নিকটবর্তী হতে পারেনি। পরবর্তীকালে জঙ্গীলাটের পদ অলঙ্কৃত করেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর বনানীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এক কাঠুরে। হাতে একটা কুড়োল। সদ্য কিনে এনেছে গভীর বনের ওপারের গাঁয়ে, কামার বাড়ি থেকে। তাই কুড়োলে এখনো কাঠের লম্বা হাতলটা লাগানো হয়নি। জল্লাদের হাতে তলওয়ার দেখলে যার মুণ্ডু কাটার বাদশাহী হুকুম হয়ে গিয়েছে, সে যেরকম কাঁপতে থাকে, লম্বা লম্বা আকাশছোঁয়া গাছগুলোও কাঠুরের হাতে নয়া কুড়োলের ঝকঝকে লোহা দেখে তেমনি দারুণ ভয় পেয়ে শিউরে উঠলো। সেটা প্রকাশ পেল তাদের বাতাসহীন আবহাওয়াতে। অকারণে ডাইনে বাঁয়ে দোলা লাগানো থেকে। মর্মর ধ্বনি জেগে উঠলো শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়। এই-এল এই-পড়ল কালবৈশাখী যখন বেগে ধেয়ে আসে বনস্পতিকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য তখন যে-রকম প্রথম সবচেয়ে উঁচু গাছগুলো আসন্ন কালবৈশাখীর আভাস পেয়ে মর্মর রবে কিশোর গাছগুলোকে হুঁশিয়ারি দেয়, তারা কচি গাছগুলোকে ঠিক তেমনি বলে "খবরদার", বিনা বাতাসে বনে বনে ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে মর্মরে মর্মরে আসমানে মাথা হেনে হেনে কাঠুরের হাতে যে কুড়োল সেটা একে অন্যকে দেখিয়ে দিলে এবং তারা যে এত শত বৎসর ধরে শান্তিতে দিন কাটিয়েছিল তার যে সমাপ্তি আসন্ন সেটাও বুঝিয়ে দিলে।

তখন এক অতি বৃদ্ধ সুদীর্ঘ, ঈষৎ ন্যুব্জদেহ তরুরাজ চিন্তাপূর্ণ গম্ভীর মর্মরে সবাইকে বললে, "বৎসগণ! আস্ত কুড়োলের ওই লোহার অংশটুকু মাত্র আমাদের বিশেষ কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে পারবে না। হয়তো সামান্য একটু আঁচড় জখম আমাদের গায়ে লাগতে পারে—তাতে করে কাঠুরের কোনো লাভ নেই—খামোখা সে-মেহনত করতে যাবে কেন সে? মরণ আসবে আমাদের সেই কুক্ষণে যে-দিন আমাদেরই একজন কাঠ হয়ে ওই লোহার টুকরোটিতে ঢুকে হাতল হয়ে তাকে সাহায্য করবে। তখন ওই কুড়োল হবে বলবান। কাঠুরের কঠিন পেশীর সুপ্ত বল আমাদেরই একজনের মিতালীতে তৈরী হাতলের ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের দ্বিখণ্ডিত করবে।"

কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে পূব পাকে নিযুক্ত পাঞ্জাবী বেহারীরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন পূব পাকের বাঙালী মুসলমান হাতলের সন্ধানে। এই পাঞ্জাবী বুদ্ধু ও বেহারী বিচ্ছেদের জন্য কুঠার-লৌহদণ্ড হয়ে এলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানী চীফ সেক্রেটারি তাঁর প্রাতঃভর্ৎসনীয় গোধূলি কর্তনীয় নাম মি. আজিজ আহমদ। এঁকে রাজধানী পাঠিয়েছিল পূর্ব পাকে অখণ্ড পাকিস্তানের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণের জন্য; তিনি পুঁতে গেলেন লক্ষাধিক টাইম-বম, যেগুলো ফাটলো চব্বিশ বছর পর।

তাঁর কীর্তিকাহিনী দীর্ঘ। আজ যে-রকম পূব পাকের "সেবা করে টিক্কা" খান জঙ্গীলাটের আসন পেয়েছেন, ঠিক তেমনি ইনিও একদিন পূব বাঙলার বাঙালী সিভিলিয়ানদের সর্বনাশ করে ও পশ্চিমাদের সর্বানন্দ দিয়ে অখণ্ড পাকের ফরেন মিনিস্টার অ্যাডভাইজার আরো কত কী হন। সে-সব থাক। আমার উদ্দেশ্য শুধু দেখানো—পার্টিশেন সত্ত্বেও উভয় বাঙলাতে যে চিন্ময়-বন্ধন ছিল সেটার সত্তানাশ মহতী বিনষ্টি কি প্রকারে করা যায় সেইটেই ছিল চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদের গুরসম রাজধানী-দত্ত সাধনার চিন্তামণি। স্বদেশী আন্দোলনবৈরী পুলিস কর্মচারী শামসুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(আলম? হুদা? হক?) বন্দী দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে প্রথম দোস্তী জমিয়ে বিস্তর গোপন তথ্য বের করে ওইগুলো দিয়ে নির্মাণ করেন সরকার পক্ষের মারণাস্ত্র। তাই আসামীরা তাঁর উদ্দেশে বলতো, "ওহে শামসুল! তুমিই আমাদের 'শ্যাম' তুমিই আমাদের 'শূল'।" আজিজের বেলা অতখানি টায় টায় শিব্রামীয় পান তৈরি হল না বটে, তবু—। আজিজ-এর অর্থ প্রিয় মিত্র; আহমদ-কে আমেদ, ইংরিজিতে "ডী" অক্ষরযোগে আমেডও লেখা হয়। দি ফ্রেন্ড—আমেড—Ah! mad! কারণ প্রবাদ আছে, মূর্খ মিত্রের চেয়ে জ্ঞানী শত্রু ভালো। এস্থলে মূর্খ মিত্র না, পূব বাঙলার উন্মাদ মিত্র।

তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা বিনাশ করা।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : পূব বাঙলার লোক এ চর্চাতে অনুপ্রেরণা প্রায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে : বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বহুলাংশে পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয়েছে। অতএব উভয় বাঙলার মাঝখানে নির্মাণ করতে হবে অভেদ্য লৌহ যবনিকা।

তৃতীয় উদ্দেশ্য : ওই রবীন্দ্রনাথ নামক লোকটির ইমেজ সম্পূর্ণ বিনষ্ট করতে হবে; সেস্থলে জাজ্জ্বল্যমান করতে হবে পাঞ্জাবী কবি ইকবালকে, তাঁর ইসলামী জোশ-সহ।

কিন্তু তিনি সেই কাষ্ঠখণ্ড পান কোথায় যেটা দিয়ে তিনি কুঠারটি নির্মাণ করতে পারেন? উচ্চপদের বাঙালী মুসলমান সিভিলিয়ানদের সেক্রেটারিয়েট থেকে খেদিয়ে তাদের পাঠানো হলো ডিস্ট্রিক্ট্‌গুলোতে—এঁদের বেশীর ভাগ এসেছিলেন শিলঙ সেক্রেটারিয়েট থেকে, সিলেটের লোক, হেথাকার রাইটারস বিল্ডিং থেকে উচ্চপদস্থ গিয়েছিলেন অল্প পরিমাণ, ছিলেনই অত্যল্প। পাঞ্জাবী বেহারীদের আধা ডজন প্রমোশন দিয়ে দিয়ে ভর্তি করা হল সেক্রেটারিয়েট—যতদূর সম্ভব। কিন্তু বাঙলার 'ক' অক্ষর দেখলেই এরা সামনে দেখে করালী। তদুপরি এদের যুক্তি "বাঙলাকো জড়সে উখাড়নেকে লীয়ে (উৎপাটন করতে) আমরা এসেছি জিহাদ লড়তে, আর বলে কিনা, শেখো বাঙলা।"....আজিজ দেখলেন, এরা সরকারী কাজই চালাতে অক্ষম, এদের দ্বারা সূক্ষ্ম প্রপাগান্ডা, রবীন্দ্রনাথের ইমেজ নাশ অসম্ভব। চাই বাঙালী।

মক্তবের মোল্লা, মাদ্রাসার নিম্নমানের মৌলবী ও ছাত্র এলেন এগিয়ে। এঁরা বাঙলা প্রায় জানেনই না। উর্দুজ্ঞান যৎসামান্য বললেও বাড়িয়ে বলা হয়। এঁরাই ছিলেন উর্দুকে পূব পাকের রাষ্ট্রভাষারূপে চাপিয়ে দেবার তরে সবচেয়ে সরব। কলকাতা বা ঢাকার বি-এ এম-এ এক বর্ণ উর্দু জানেন না। অতএব উর্দু চালু হলে মাদ্রাসার ম্যাট্রিক মানের পড়ুয়া হয়ে যাবে কমিশনার, ক্লাস সিকসের ছোঁড়া হবে ডি-এম! "উর্দু জবান জিন্দাবাদ!"

এরা দিল পয়লা নম্বরী ধাপ্পা আজিজ এবং তাঁর প্যারা উর্দুভাষী ইয়ারদের। এরা কতখানি বাঙলা জানে, সে বাঙলা দিয়ে বাঙলা কৃষ্টি ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে কি না সেটা বোঝবার মত বাঙলা এলেম তো আজিজ গোষ্ঠীর নেই। এদেরই অনেকে পরবর্তীকালে অল-বদরে দাখিল হয়ে দক্ষতার সঙ্গে খান অফিসারদের খবর যোগায়, কোথায় কোন্ বুদ্ধিজীবী বাস করে, কাকে কাকে খুন করতে হবে। অস্ত্রসমর্পণের দিন অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর সকালবেলা যখন যুদ্ধ সমাপ্তি তথা আত্মসমর্পণের দলিলাদি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে বলে আমারই পরিচিত দুজন বাঙলা-প্রেমী বুদ্ধিজীবী, এতদিন পালিয়ে পালিয়ে থাকার পর নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন পরিবারে ফিরে এসে এসে স্বস্তিতে ঘুমুচ্ছিলেন, তখন এই অ ' বদর্‌রাই মা, স্ত্রী, শিশু পুত্রকন্যার সামনে দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতভাগ্যকে বন্দুকের সঙ্গিন দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে চোখে পট্টি বেঁধে কোনো এক অজানা জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর তাঁদের গুলি করে মারে।

ওদিকে বাঙালী মুসলমান উঠে পড়ে লেগেছে, ভাষা আন্দোলন নিয়ে। তারা এটা চায় ওটা চায়, সেটা চায়। মারা গেল কিছু প্রাণবন্ত তেজস্বী ছেলে বন্দুকের গুলিতে। আন্দোলন তীব্রতর রূপ ধারণ করতে লাগলো প্রতিদিন।

অতিশয় অনিচ্ছায় পাক সরকার দুধের ছলে কিঞ্চিৎ পিটুলি-গোলা পরিবেশন করলেন "বাঙলা আকাডেমি" নীম দিয়ে। তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন গোটা কয়েক বিচ্ছু—বিসমিল্লাতেই। এঁরা সেই মোল্লা মুনসীর মত—যাদের কথা এই মাত্র নিবেদন করেছি—অত্যল্প শিক্ষিত নন। এঁরা বেশ কিছুটা শাস্ত্র জানেন, অল্পবিস্তর বাঙলাও লিখতে পারেন।

সরকার দিয়েছে টুঁইয়ে। এঁরা ধরলেন জেদ অ্যাকাডেমির সর্বপ্রথম কর্তব্য রূপে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে (কে কখন স্বীকৃতি দিল, জানিনে) বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে হবে আরবী ভাষায় লিখিত বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ করে। প্রতিবাদ করেছ কি মরেছ। তদ্দণ্ডেই তোমার নামে "কাফির" ফৎওয়া জারী হয়ে যাবে। অথচ ভেবে দেখনি আমাদের সাহিত্য পরিষদ যদি জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে মেতে উঠতো বেদ থেকে আরম্ভ করে ঘেরণ্ডসংহিতা আর খট্টাঙ্গ পুরাণের বাঙলা অনুবাদ করতে, তবে লুপ্তপ্রায় বাঙলা পাণ্ডুলিপি থেকে অমূল্য গ্রন্থরাজি উদ্ধার করে খাস বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতো কে? কোন্ পাষণ্ড অস্বীকার করবে সংস্কৃত এবং আরবী প্রচুর গ্রন্থ বাঙলাতে অনুবাদ করা অতিশয় কর্তব্য কর্ম? কিন্তু প্রশ্ন, সেইটেই কি সাহিত্য পরিষদ বাঙলা অ্যাকাডেমির সর্বপ্রধান ধর্ম?

পাঠক, তুমি বড় সরল। বিলকুল ঠাহর করতে পারো নি কার ঘুমন্ত হাত দিয়ে কে, কোন তৃতীয় ব্যক্তির তামাক চুপসে—না ভুল বললুম—সগর্বে খেয়ে গেল।

অ্যাকাডেমি পয়লা ধাক্কাতেই স্থির করলেন—একদম পয়লা ধাক্কাতে কিনা আমার সঠিক মনে নেই—কোন একাদশ ভলুমী আরবী কেতাব (হয়তো অত্যুত্তম গ্রন্থ) বাঙলায় বেরুবে বিশভলামী কলেবর নিয়ে। খাস বাঙালী সাহিত্যিক দল তদ্দণ্ডেই হয়ে গেলেন অপাঙক্তেয় খারিজ বাতিল ডিসমিস। কারণ তাঁরা তো আরবী জানেন না। কোনো এক মৌলবী সাহেব অনুবাদ কর্মের জন্য দক্ষিণা পাবেন ষাট না সত্তর হাজার টাকা!

বেচারী ডিরেক্টর! সে আপ্রাণ লড়েছিল। শেষটায় বোধ হয় মৌলবীরাই তাঁর চাকরিটি খান।

আমি হলপ করতে পারবো না বিশ ভলুমের অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছিল কিনা। ক-ভলুম এ-তাবৎ বেরিয়েছে তাও বলতে পারবো না। এ-প্রতিবেদনে আরো ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের মৎলব কি ছিল সেটা বুঝিয়ে বলাটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

উভয় বাঙলা—গজভুক্ত পিণ্ডিবৎ

বড় বড় শহরের লোক বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে বড্ডই বে-খবর। তাদের ভাবখানা অনেকটা যেন কুল্লে দুনিয়ার মেয়েমদ্দে যখন হুমড়ি কেয়ে আমাদের এই হেথায় জমায়েত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে, তখন তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমরাই ইনট্রস্টিং, আমরাই ইমপর্টেন্ট। মা-কালী তো কালীঘাট ছেড়ে ধাক্কাধাক্কি খেয়ে ট্রামে-বাসে আসেন না আমার বাড়িতে, কিংবা মহরমের তাজিয়া-তাবুদ তো লাটবাড়ির বৈঠকখানায় বসে হা-পিত্যেস করেন না হুজুরকে এক নজর দেখবার তরে।...এ বাবদে সবচেয়ে বেশী দেমাক ধরে প্যারিস। আর ধরবেই না কেন? যে মার্কিন মুল্লুক দুনিয়ার যে দেশকে খুশী রুটীটা আণ্ডাটা বিলিয়ে দেয়—মতলবটা কি সব সময় মালুম তক হয় না—সেই দেশের লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে ছোটে ছুটি কাটাতে, প্যারিসের তাজ্জব তাজ্জব এমারত-তসবীর দেখতে, কুল্লে জাতে ভর্তি নানান রঙের নানা ঢঙের খাপসুরৎ খাপসুরৎ পটের বিবিদের মোলায়েম-সে-মোলায়েম হাত থেকে সাকীর ভরা পেয়ালা তুঁলে নিতে আর তারি সঙ্গে খাপ খাইয়ে খৈয়ামের স্মরণে বেখাপ্পা খাদে গান জুড়তে—

বিধি-বিধানের শীত, পরিধান
প্যারিসে-আগুনে দহন করো।
আয়ু বিহঙ্গ উড়ে চলে যাবে
হে সাকী, পেয়ালা অধরে ধরো। (অনুবাদক?)

এ-বাবদে আমরা, কলকাত্তাইয়ারা ঘোড়ার রেসে মোটেই 'ব্যাড থার্ড' নই, 'অলসো র‍্যান' বললে তো আমরা রীতিমত মান-হানির মোকদ্দমা রুজু করবো।

আমরা ভাই ঢাকা তথা পূব-বাঙলার সাহিত্য-চর্চা সম্বন্ধে চিরকালই কিঞ্চিৎ উদাসীন ছিলুম—দেশবিভাগের পর তো আর কথাই নেই। আর হবই না কেন,—রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র সবাই তো শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই থানা গেড়েছেন। এস্তেক যশোরের 'বাঙাল' মাইকেল।

পার্টিশনের পরে অবস্থাটা খারাপ হল। কবি জসীমউদ্দীন, চিত্রকর জয়নুল আবিদীন, উদীয়মান কবি/সাহিত্যিক আবুল হোসেন, শওকৎ উসমান, গোলাম মুরশিদ, পণ্ডিত শহীদুল্লা—বোধ হয় পূর্বেই চলে গিয়েছিলেন—মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের শদতাত্ত্বিক আব্দুল হাই যাঁর অকালমৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, একাধিক মহিলা কবি আরো বহু বহু সাহিত্য-সঙ্গীত-কলাসেবক চলে গেলেন পূব বাঙলায়। এবং এঁরা যে পেনসেন নেওয়ার পর এবং/অথবা বার্ধক্যে, বিশেষ করে যাঁদের জন্মভূমি পশ্চিম বাঙলায়—তাঁরা যে সে সব জায়গায় বা কলকাতায় ফিরে এসে, মহানগরীর সুযোগ সুবিধে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতর সেবা করতে পারবেন সে-আশাও রইল না। ...বলা বাহুল্য আমার দেওয়া সাহিত্য-সেবীদের এ ফিরিস্তি লজ্জাকর অসম্পূর্ণ।

পূব-বাঙলার যে সব লেখক ও অন্যান্য কলাকার এখানে রয়ে গেলেন ও ওপার বাঙলা থেকে যাঁরা এলেন, তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। কেউ কেউ পাঞ্জাবীকণ্টকিত পাক-সরকার কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে পূব-বাঙলা ত্যাগ করতে বাধ্য হন, কিন্তু এঁদের সকলেই আপন আপন সহকর্মীদের প্রতি এবং মাতৃভূমি পূববাঙলার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। ৭১-এর নয় মাসে সেদেশে বুদ্ধিজীবী নিধনে এঁদের অনেকেই ভ্রাতার চেয়ে প্রিয়তম আত্মজন হারিয়েছেন। দার্শনিক গোবিন্দবাবু এবং তাঁরই মত একাধিক অধ্যাপকের নিষ্ঠুর হত্যা আমাকে ও তাঁদের অগণিত অনুরক্ত জনকে কী গভীর বেদনা দিয়েছে, তা প্রকাশ করার ক্ষমতা বিধি আমাকে দেননি।

পূর্বোক্ত দুই পক্ষই—এ-বাঙলা থেকে যাঁরা ও-বাঙলা গেলেন এবং ওদিক থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিক এলেন, এঁরাই ছিলেন উভয় বঙ্গের সর্বপ্রধান চিন্ময় বন্ধন, মূর্তিমান সেতু, পিণ্ডির পাশবিক বৈরী ভাব ছিল প্রধানত এঁদেরই প্রতি। তাই সে নির্মাণ করেছিল লৌহযবনিকা প্রস্তর-প্রাচীর। অতীতেও নির্মিত হয়েছিল নিশ্চয়ই, নইলে নিউটন আক্ষেপ করলেন কেন—

হায়রে মানুষ
বাতুলতা তব
পাতাল চুমি :—
প্রাচীর যত না
গড়েছো, সেতু তো
গড়োনি তুমি!

এই দুই পক্ষই সবচেয়ে বেশী খবর নিতেন উভয় বাঙলার সাহিত্য-চর্চার। এঁদের কেউ কখনো অপর বাঙলায় যাবার দুরূহ অতএব বিরল সুযোগ পেলে সেখানে রাজ-মর্যাদায় আপ্যায়িত হতেন। পূব-বাঙলা স্বাধীন হওয়ার পূর্বে আমি ১৯৭০-এ যাই ঢাকা। মরহুম শহীদুল্লা তখন হাসপাতালে। ঢাকায় প্রকাশিত পুস্তক ও কলকাতায় প্রকাশিত একাধিক পুস্তিকা তিনি ৬৯-এই মমাগ্রজের গৃহে সেই বৃদ্ধ বয়সে স্বয়ং এসে আমাকে সস্নেহ আশীর্বাদসহ উপহার দিয়ে যান। (তাঁর কৃতী পুত্রেরও একাধিক পুস্তকও তিনি তার সঙ্গে যোগ দেন) আঞ্চলিক অভিধানের প্রথম খণ্ড, হাফিজের অনুবাদ, চর্যাপদের আলোচনা কী না ছিল তাঁর ত্রিপিটকপূর্ণ সওগাতে! গুণী আবদুল কাদের যে কী পরিশ্রম, অন্বেষণ ও অধ্যয়নান্তে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পূর্ণ গদ্য-পদ্য সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন, সেটা বর্ণনাতীত। অনবদ্য এই মণিমঞ্জুষা। সম্প্রতি কাগজে দেখলুম, বাংলাদেশে প্রকাশিত তাবৎ পুস্তক বিক্রয়ের জন্য এখানে একাধিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ত্বরা করুন, ত্বরান্বিত হোন, গৌড়-সাহিত্যামোদিগণ! সর্বশেষ অঙ্গবস্ত্রটি অকাতরে চক্রবৃদ্ধিহারে কুসীদার্পণ প্রতিশ্রুতিসহ সমর্পণ করে প্রয়োজনীয় কার্যাপণ সংগ্রহ করুন—অমূল্য এই গ্রন্থাবলী ক্রয়ার্থে। 'বিলম্বে হতাশ হইবেন'—বিজ্ঞাপনের অতিরঞ্জিত অত্যুক্তি নয়, সকল শাস্ত্রবিচারদক্ষের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী।

মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে বিজ্ঞানের রাজ্যে এমন একখানা পুস্তক ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন বই উভয় বাঙলায় পূর্বে বেরোয়নি, আগামী শত বৎসরের ভিতর বেরুবে কিনা সন্দেহ। পণ্ডিত আব্দুল জব্বর রচিত এই 'তারা পরিচয়' গ্রন্থখানিকে 'শতাব্দীর গ্রন্থ' বলে তর্কাতীত দার্ঢ্যসহ পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। এ-গ্রন্থের উল্লেখ আমি পূর্বেও করেছি, ভবিষ্যতে সবিস্তর বর্ণনা দেবার আশা রাখি। ...কাজী কবির গ্রন্থাবলী ও এ-গ্রন্থ উভয়ই প্রাগুক্ত আব্দুল কাদের যখন 'বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের' কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তাঁরই উৎসাহে বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয়ই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আপ্রাণ চেষ্টা দিয়েছিলেন, বাঙলা অ্যাকাডেমি, 'বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানই যেন জন্মগ্রহণ না করতে পারে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোড়াতে ক্ষীণ কণ্ঠে বাঙলার ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যে সব দাবি উত্থাপন করা হয়, সেটাকে ঠেকাবার জন্য স্বয়ং মি. জিন্না ঢাকায় "তশরীফ" আনেন এবং ছাতির খুন বেকার বেফায়দা ঠাণ্ডা পানিতে বরবাদ অথবা শীতল জলে অপচয় করলেন—যেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরফে বেশী কাছাকাছি সেইটেই বেছে নিন—সেই দাবি প্রতিদিন কঠিনতর ভাষায় এবং সর্বশেষে রুদ্ররূপ ধারণ করলো। আমরা এ বাঙলায় বসে তার কতটুকু খবরই বা রাখতে পেরেছি। শুধু জানি, কয়েকটি তরুণ দাবি জানাতে গিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত হল—শহীদের গৌরব লাভ করলে।

কিন্তু সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন অ্যাকাডেমি, বোর্ড, এমন কি এশিয়াটিক সোসাইটি অব ইস্ট পাকিস্তান, যাদুঘর (এরই নবীন হর্ম্যের প্রস্তর স্থাপনা কালে গবর্নর মেনায়েম খান "যাদু" শব্দটা সংস্কৃত মনে করে তীব্র কণ্ঠে উষ্মাভরে গোসসা জাহির করেন) সর্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা, ভিতর থেকে, সরকারের তথাকথিত "ইসলামী তমদ্দুম" (ইসলামী সভ্যতা—শব্দার্থে নাগরিকতা) দ্বারা অনুপ্রাণিত নির্দেশ সাবোটাজ করেছেন অমান্য করে, টালবাহানা দিয়ে ফন্দিফিকির মারফত বানচাল করে দিয়ে । এ সংগ্রামের কাহিনী খুদ ঢাকাবাসীদের মধ্যেই জানেন অল্প লোক।

প্রাগুক্ত "রাজমর্যাদায় আপ্যায়নের" ফলে আমার মত অকিঞ্চিন জন পরিচিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত লেখকদের কাছ থেকে প্রায় ষাটখানা পুস্তক-পুস্তিকা উপহার পায়। আমাকে (এ-সব সজ্জন) ভ্রমবশত পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চার অন্যতম প্রতীকরূপে ধরে নিয়েছিলেন, এবং সে-চর্চার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল। "দেশ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় বলতে পারবেন, কত না দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, লৌহযবনিকার ছিদ্র দিয়ে তাঁর কাছে পৌঁচেছে পূব বাঙলার বই সমালোচনার জন্য—চব্বিশটি বৎসর ধরে। পশ্চিম বাঙলার স্বীকৃতি ছিল তাঁদের হার্দিক কামনা।

লৌহযবনিকাপ্রান্তে পুস্তকগুলি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার ভয় তো আছেই, তদুপরি পুস্তক স্মাগলিং নামক পাপাচার প্রচেষ্ট ব্যক্তির যে নূন্যতম শাস্তি—সেটা অর্থদণ্ড। সীমান্ত অতিক্রম করবার সময় যে বিংশতি মাত্র পাকিস্তানী মুদ্রা আইনত অনুমোদিত, সে-মুদ্রা কটি অশ্যই ওই অর্থদণ্ড পরিশোধ করার জন্য অপ্রচুর। ফলং? শ্রীঘর বাস।

কিন্তু আল্লা মেহেরবান। সীমান্তেও কিছুসংখ্যক বঙ্গসন্তান ছিলেন যাঁরা পূর্বোক্ত রাষ্ট্রাদেশ লঙ্ঘনকারীদের ন্যায় সুচতুর এবং সদৃশ পাপী-তাপীদের প্রতি সদয়। তাই মমাগ্রজদের লিখিত দুচারখানা পুস্তক বৈতরণীর এ-কূলে আনতে সক্ষম হয়েছি—প্রতিবার।

উভয় বাঙলা—স্বর্ণসেতু রবীন্দ্র সঙ্গীত

এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, এক বাঙলা আরেক বাঙলা থেকে যদি পাকেচক্রে কোনোদিন স্নেহপ্রীতির ভুবনে দুই দিনান্ত চলে যায়, এস্তেক ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মোহনবাগানের ফুটবল খেলা বন্ধ হয়ে যায়, ঘটিমাত্রই ইহসংসারে বাঙাল নামক যে একটা প্রাণী আছে সে তত্ত্ব বেবাক ভুলে গিয়ে তাকে হাইকোর্টটা পর্যন্ত দেখাতে রাজী না হয়, এবং পদ্মার ওপারে কুট্টির সঙ্গে ঘটির ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি শুনে ঘোড়াটা যদি না হাসে, তবু একটি বেরাদরী রেওয়াজ দুই বাঙলা থেকে কিছুতেই লোপ পাবে না।

রবীন্দ্র সঙ্গীত।

কেন্দ্রীয় পাক সরকার উভয় বাঙলায় চলাচলের পথ প্রতিদিন দুর্গমতর করতে লাগলো—আন্তর্জাতিক জনসমাজে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হবে বলে বনগাঁ-যশোরের সঙ্কীর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিন্ধু পারে আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে হয়েছে আমার চেনা—' সঙ্গে সঙ্গে যেন এক কঠোর আঘাতে বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, কবি কী সামান্যতম ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি তাঁর কত না প্রিয়জনের অকারণে-অকালে তার পড়ল যখন ডাক তখন তাকে খেয়ায় একান্ত একাকী উঠতে দেখেছেন শোকাতুর চিত্তে, অশ্রুহীন শুষ্ক নয়নে। এখন তিনি সে-খেয়ার সঙ্গে বেদনা বেদনায় এতই সুপরিচিত যে তিনি যেন প্রস্তুত হয়ে আছেন, ভাবছেন—নিয়ে যাব ইহার উত্তর নিজ হাতে করে আমি ওই খেয়া পার করি ভয়!

রবীন্দ্র-স্পেশালিস্ট আমি নই, কাজেই শপথ করতে পারবো না, কবির বর্ষাগীতিতে পূব বাঙলার অধিকতর বর্ণনা আছে। কিন্তু একথা সত্য খেয়া ঘাট, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার, হে বিরাট নদী, এ-সব মোতীফ ভাটিয়ালি গীত মারফত বহুকাল ধরে পূববঙ্গীয়ের নিত্য-দিনের সখা। কভু বা পার্থিবার্থে—চিন্তা-মণির সন্ধানে সে ও-পারে যেতে চায়, কভু বা সে নদীকে দেখে বৈতরণী রূপে। গহীন গাঙের নাইয়া, তুমি যদি হও গো নদী, তুমি কেবা যাও রে, লাল নাও বাইয়া, একখান কথা শুন্যা যাও নীল বৈঠা তুল্যা, মানিকপীর ভবনদীপার হইবার লা—এসব দিয়ে গড়া তার হৃদয়। সেইখানেই তো রবির প্রথম আলোর চরণধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তারা জেগে উঠে সাড়া দেবে—এতে আর কিমাশ্চর্যম?

উভয় বাঙলা—ফুরায় যাদেরে ফুরাতে

মেদিনীপুর, বাঁকুড়ায় অর্থাৎ রাঢ়ভূমির পশ্চিমতম প্রান্তে, অতএব উভয় বাঙলারই অস্তাচলে বসবাস করার সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত, কিন্তু বাল্যে রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ সেবক ঈশ্বর রাজেন বন্দ্যো, নন্দলাল, অবন ঠাকুরের শিষ্য ঐ পরিবারের চিত্রকর-শ্রীযুত সত্যেন, শান্তিনিকেতন লাইব্রেরির আজীবন একনিষ্ঠ সেবক ঈশ্বর সত্য, পরবর্তীকালে তাঁর কন্যা উভয় বঙ্গের গণমোহিনী গায়িকা, স্বয়ং পূর্ববঙ্গের প্রতি সবিশেষ অনুরক্তা শ্রীমতী কণিকা মোহর, এঁদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেছি কয়েক বৎসর ধরে। শ্রীযুত সত্যেনকে কলাজগতের বিস্তর রসগ্রাহী চেনেন সরল, নিরলঙ্কার, দৈনন্দিন জীবনের সহজ চিত্রকর রূপে, কিন্তু তাঁকে আমি পেয়েছিলুম উপগুরুর ছদ্মবেশে। আমার খাজা বাঙলা উচ্চারণ তিনি মেরামৎ করার চেষ্টা দিতেন কথাচ্ছলে, আমাকে অযথা আত্মসচেতন না করে দিয়ে। এবং একটু মৃদু হাস্য যোগ দিয়ে বলতেন, "বাঁকড়োয় আমরা কিন্তু বলি....।"

পূর্বতম প্রান্ত সিলেট-কাছাড় আমি ভালো করেই চিনি। দুই অঞ্চলে নিশ্চয়ই নানা বিষয়ে পার্থক্য আছে। বস্তুত প্রথম দর্শনে অনভিজ্ঞজনের চোখে পার্থক্যগুলোই ধরা পড়বে বেশী। কিন্তু একটু গভীরে তলালেই চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করে ফেলবেন যে সাদৃশ্যটাই ঢের বেশী। এবং এত বেশী যে ঠিক ঐ কারণেই পার্থক্যগুলো আরো যেন স্পষ্টতর হয়। সাদৃশ্যের স্বচ্ছ জলে পার্থক্যের একটি মাত্র কালো চুল চোখে পড়ে। আবিল আবর্তে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড লুকিয়ে থাকে। গুণীরা তাই বলেন, সাধুজনের অতি সামান্য পদস্খলন নিয়ে পাঁচজন সমালোচনা করে, অসাধুর পর্বতপ্রমাণ পাপাচার সম্বন্ধে মানুষ অপেক্ষাকৃত উদাসীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাপ্রসঙ্গে দুই বাঙলার পার্থক্যের প্রতি যদি আমি ইঙ্গিত করি তবে উভয় বাঙলার পাঠক যেন সাদৃশ্যের মূল তত্ত্বটা ভুলে গিয়ে অনিচ্ছায় আমার প্রতি অবিচার না করেন।

মহানগরী কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের সুদূরতম প্রান্তে, এমন কি পূব বাঙলারও কিয়দেশে যে প্রভাব বিস্তার করে সে তুলনায় মফঃস্বলের উপর ঢাকার প্রভাব যৎসামান্য। তদুপরি কলকাতা যে শুধু ঢাকার তুলনায় বহুলাংশে বৃহত্তর তাই নয়, বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লীকেও অনায়াসে বহু বিষয়ে অপাংক্তেয় রেখে সে চীন জাপানের সঙ্গে পাল্লা দেয়। কিন্তু সে আলোচনা আরেকদিন হবে। উপস্থিত আমার বক্তব্য, যদিও কলকাতা পরশু দিনের আপস্টার্ট নগর তবু ধীরে ধীরে তার একটা নিজস্ব নাগর্য বা নাগরিকতা গড়ে উঠছে। নাগরিক বলতে একটা শিষ্ট, ভদ্র, রসিক এবং বিদগ্ধজনকে বোঝাত। এমন কি চলতি কথায়ও নাগরপনা, নাগরালি এবংং শহরবাসী অর্থে নগুরে, আজকাল বলি শহুরে, এককালে খুবই প্রচলিত ছিল। উর্দুতে কৃষ্টি, বৈদগ্ধ্য অর্থে ইদানীং তমদ্দুন শব্দ ব্যবহার করা হয়। তারও মূল মদীনা বা শহর—আমরা মদীনা বলতে যে নগর বুঝি সেটার পূর্ণ নাম "মদীনাতুন নবী" অর্থাৎ নবীর (প্রেরিত পুরুষের) নগর।

উন্নাসিক নাগরিক জনের কৃত্রিম আচার ব্যবহার সর্বদেশেই সুপরিচিত। তাই ইংরিজিতে সফিসটিকেটেড শব্দের অর্থে যেমন কৃত্রিমতার কদর্থ আছে তেমনি উচ্চাঙ্গের সার্থক জটিলতার সদর্থও আছে। ১৯৭১-এ আমরা প্রায়ই বিদেশী রিপর্টারের লেখাতে পড়েছি, "সাদামাটা রাইফেল নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা কি করে লড়বে পশ্চিম পাক আগত সর্বপ্রকারের সফিসটিকেটেড হাতিয়ার, যেমন রাডার, স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান ইত্যাদির বিরুদ্ধে?....তাই হাফবয়েলড, অর্ধসিদ্ধ আসিদ্ধ সফিসটিকেটেড জন, প্রাচীনার্থে নাগরিক যদি তার নাগরিমায় সত্যকার বৈচিত্র্য, উদ্ভাবনশীলতা না দেখাতে পারে তবে সে নিছক "নূতন কিছু করো" প্রত্যাদেশ মেনে নিয়ে অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন উদ্ভাবনায় লেগে যায়।

প্রাক্তন বেতার মন্ত্রী শ্রীযুত কেশকার একদা ফরমান দিলেন, যার ভাবার্থ : আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভূরি ভূরি রাগ-রাগিণী অনাদরে অবহেলায় লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আকাশবাণী যেন অচলিত রাগ-রাগিণী যাঁরা আজো গাইতে পারেন তাঁদের পরিপূর্ণ মাত্রায় উৎসাহিত করে।

এ-কথা অবশ্যই সত্য গণতন্ত্রের যুগে গানের মজলিসে আসে হরেক রকমের চিড়িয়া। তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী শ্রীমতী অর্চনা রীতিমত বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়ে শুনিয়েছেন হাবিজাবি লোকের কথা বাদ দিলেও তিনি আদৌ বুঝতে পারেন না, সঙ্গীতের প্রতি যাদের কণামাত্র আকর্ষণ নেই সে-সব হোমরাচোমরারা শাস্ত্রীয় উৎকৃষ্টতম সঙ্গীতের আসরে আদৌ আসেন কেন?

তাঁদের আসাটা অর্থহীন নয়, উভয়ার্থে। কিন্তু ক্ষতি যেটা হয় সেটা সুস্পষ্ট। কর্মকর্তাগণ, এবং তাঁদের চাপে পড়ে আকছারই ওস্তাদরাও অতি প্রচলিত হালকা, এমন কি তার চেয়েও নিরেস গানেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখেন, হোমরাদের প্রীত্যর্থে। অচলিত দূরে থাক, অপেক্ষাকৃত বিদগ্ধ কিন্তু বহুজনপ্রিয় রাগ-রাগিণীও অবহেলিত হয়।

কিন্তু শ্রীযুত কেশকারের ফরমান আনলো বিপরীত ফল। সরকারী প্রতিষ্ঠান মাত্রই "ডেকে আন" বললে "বেঁধে আনাটাই" প্রশস্ততম পন্থা বলে সমীচীন মনে করেন—জাস্ট টু বি অন দি সেফ সাইড। তাবৎ ভারতের কুল্লে স্টেশন থেকে "মার মার" শব্দ ছেড়ে বেরুলেন কর্মচারীরা "অচলিতের' সন্ধানে। হাওয়ার গতি ঠাহর করে যতসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজেবাজে গাওয়াইয়ারা অচলিত রাগ-রাগিণীর স্থলে বাঘ-বাঘিনীর লম্বা লম্বা ফিরিস্তি পাঠাতে লাগলেন বেতারের কেন্দ্রে কেন্দ্রে। তাঁরা গাইলেন সেগুলো, বহু ক্ষেত্রে কেন্দ্রেরই কর্মচারী রচিত নাতিদীর্ঘ বাগাড়ম্বরসমৃদ্ধ ভূমিকাসহ; সে অবতরণিকায় বোঝানো হল, "এই ভয়ঙ্কর রাগটি কি প্রকারে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত জীবন্মৃত থাকার পর অদ্য রজনীতে ওস্তাদস্য ওস্তাদ অমুক তাকে সগরসন্তানবৎ প্রাণদান করলেন।" আমার মত ব্যাক-বেঞ্চারের কথা বাদ দিন—আমার কান ঝালাপালা—একাধিক বিদগ্ধজনকে দেখলুম, বেতারের কান মলে সেটাকে বন্ধ করতে।

কেউ শুধলো না, যুগ যুগ ধরে এসব রাগ জীবন্মৃত ছিলই বা কেন আর মরলই বা কেন?

একটা কারণ তো অতি সুস্পষ্ট। রসিক বেরসিক কারোরই মনে রসসঞ্চার করতে পারেনি বলে।

তুলনাটা টায় টায় মিলবে না, তবু সমস্যাটা কথঞ্চিৎ পরিষ্কার হবে। ঋতুসংহার নাকি টোলের ছাত্রেরা পড়তে চায় না; সর্বনাশ, ওটা অচলিত ধারায় পৌঁছে যাবে। বন্ধ করো মেঘদূত। চালাও ঋতুসংহার, জগদানন্দ জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেললেন বলে! বন্ধ করো চণ্ডীদাস, অষ্টপ্রহর গাও, "ভনয়ে জগদানন্দ দাস।" কী বললে, কবিগুরুর প্রথম কাব্য কবিকাহিনী অনাদৃতা। বন্ধ করো পূরবী। চালাও দশ বছর ধরে কবিকাহিনী।

এইবারে আমি মোকামে পৌঁছেছি।

জানেন আল্লাতালা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এই অচলিতের সন্ধান কি প্রকারে কখন মহানগরীর বিদগ্ধ সফিস্টিকেটেড রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক-গায়িকার ভিতর সঞ্চারিত হয়ে গেল—আচম্বিতে। তাঁদের চেলারা লেগে গেলেন শতগুণ উৎসাহে। শুনেছি সে-সব প্রাচীন গানের অনেকগুলোরই স্বরলিপি নেই, এমন কি সামান্যতম রাগ-রাগিণীরও নির্দেশ নেই। খোঁজো খোঁজো অথর্ব বৃদ্ধবৃদ্ধাদের যারা হয়তো বা কোনো দিন ব্রহ্মমন্দিরে ঐসব অচলিত গানের দু-চারটে শুনেছিলেন এবং কষ্ট করলে হয় তো বা স্মরণে আনতে পারবেন। অবশেষে এই প্রচণ্ড অভিযানের ফলে এমন দিন এল যখন কেউ "এস নীপবনে" বা "আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি' গান ধরলে আর সবাই,

কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,
কেহ বা চলে যায় ঘরে—

হয়তো বা ফিসফিসিয়ে একে অন্যকে শুধোয়, "এর চেয়ে হ্যাকনিড গান কি খুঁজে পেল না মেয়েটা?"

প্রথম যুগের গানে উত্তম গান নেই এহেন প্রগল্‌ভ বচন বলবে কে?

আনন্দের দিনে, গানের মজলিশ শেষ হয়ে গিয়েছে কবিও চলে গিয়েছেন, কিন্তু দীনেন্দ্রনাথ, ভীমরাও শাস্ত্রী, উৎসব উপলক্ষে কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত দুচার জন প্রবীণ গায়ক, অপেক্ষাকৃত নবীনদের ভিতর নটুদি, হয়তো অনাদিদা—পরে হয়তো এসে জুটবেন কাঙালীচরণ—এঁরা তখন সবেমাত্র তেতে উঠেছেন। এঁদের মুখে তখন শুনেছি কিছু কিছু প্রাচীন দিনের গান। প্রধানত সুরের বৈশিষ্ট্য, অজানা কোনো বৈচিত্র্যের জন্য বা আমার অজানা অন্য কোনো কারণে, কিন্তু তাঁরা বার বার ফিরে আসতেন প্রচলিত গানে। কিন্তু ভুললে চলবে না, এঁদের সকলেরই ছিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অপর্যাপ্ত অধিকার। ১৯১৯ সালে সিলেটে কবিগুরুর কণ্ঠে শুনেছিলুম, "বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।" তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক-বছর পরে শুনলুম আরেক ওস্তাদের গলায়। মাত্র তিনটি ছত্র—গেয়েছিলেন প্রায় আধঘন্টা ধরে।...কিন্তু অচলিত গানের তরে এই উৎসাহেরও একটা মাত্রা থাকা উচিত। অবশ্য জানিনে অধুনা এ সফিস্টিকেশন কোন্ সপ্তকে গিটকিরির টিটকিরি দিচ্ছে, বা অন্য কোনো সফিস্টিকেশনে মেতে উঠেছে।

পূব বাঙলায় এ হাওয়া কখনো বয়েছে বলে শুনিনি! খুদ ঢাকা-ই সফিস্টিকেটেড নয়—ছোট শহর গ্রামাঞ্চলের তো কথাই ওঠে না। একটা কথা কিন্তু আমি বলবো, এ বাঙলার রসিকজন আমার উপর যতই অপ্রসন্ন হন না কেন, পূব বাঙলার তরুণ-তরুণী যখনই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম তৈরী করে বা প্রাণের আনন্দে গান গায় তাদের নির্বাচন প্রায় ব্যত্যয়হীন চমৎকার। তারা লিরিকাল শব্দের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য হৃদয় দিয়ে চিনে নেয় অক্লেশে, গান গায় অতি সহজ ভঙ্গিতে। মাস কয়েক পূর্বে টেলিভিজনে দেখলুম, শুনলুম, এক বিলিতি পাদ্রী সাহেব রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাঙ্গ্ময় হয়ে গাইলেন, বাঙালের সরল ভঙ্গিতে : "ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু।" অপূর্ব! অপূর্ব!!

উভয় বাঙলা—অকস্মাৎ নিবিল দেউটি দীপ্ততেজা রক্তস্রোতে

এ বাঙলার পুস্তক প্রকাশকরা অবশ্যই পাকিস্তানী ব্যান দ্বারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। দেশ বিভাগের পূর্বে পশ্চিম বাঙলায় প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক, তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেফারেনস পুস্তক, কথাসাহিত্য, মাসিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি ইত্যাদি বিস্তর পুস্তক পূব-বাঙলায় নিয়মিত বিক্রি হত। একদা সাধনোচিত ধামে গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলেন, কলকাতার পরই জেলা হিসেবে ধরলে সিলেটে তাঁর কাগজ 'প্রবাসী'' সবচেয়ে বেশী বিক্রী হত। প্রকাশক সম্পাদক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের চেয়েও বেশী বিপদে পড়ে লেখক। তখন কিছু লেখক বিক্রি বাড়াবার জন্য আরো ''জনপ্রিয়'' হতে গিয়ে লেখার মান নামিয়ে দেন। একাধিক সম্পাদক প্রকাশক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক, জটিল সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যাময় কথাসাহিত্য ছাপতে দ্বিধাবোধ করেন। পক্ষান্তরে হুজুগে বাঙালী কোনো-কিছু একটা নিয়ে মেতে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর প্রকাশক সেটা নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাশি রাশি ফরমাইশি বই রাতারাতি ঝপাঝপ বাজারে ছাড়তে আরম্ভ করেন। তড়িঘড়ি লেখা ফরমাইশি কেতাব অধিকাংশ স্থলেই নিম্নমানের হতে বাধ্য। পাঠকের রুচিকে এরা নিম্নস্তরে টেনে নামায় এবং তথাকথিত ''গ্রেশামের' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চমানের পুস্তক সম্মান হারায় ও মুক্ত হট্ট থেকে বিতাড়িত বা অর্ধ-বহিষ্কৃত হয়।

পশ্চিম বাঙলার প্রকাশক লেখক ওই নিয়ে অত্যধিক প্রতিবাদ আর্তনাদ করেছিলেন বলে মনে পড়ে না। না করে ভালোই করেছেন। একে তো তাতে করে কণামাত্র লাভ হত না, উল্টে পিণ্ডি সেগুলো বিকৃতরূপে ফলাও করে পশ্চিম পাকে প্রপাগান্ডা চালাত—যে পশ্চিমবঙ্গ পুস্তকাদির মারফত পূর্ববঙ্গীয় ''মোহাচ্ছন্ন'' মুসলমানদের উপর তার ''সনাতন 'কাফিরী হিন্দু' প্রভাব প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে, তারা কিছুতেই বাঙালী মুসলমানকে খাঁটি মুসলমান হতে দেবে না।'' সম্পাদকরা অবশ্য তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—সেটা করা তাঁদের কর্তব্যও বটে। পিণ্ডি তার পূর্ণ ''সদ্ব্যবহার'' তখন করেছে : এখনো মি. ভুট্টো নানা কৌশলে এদেশের খবর, সম্পাদকীয় মন্তব্যের কদর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিত্য নিত্য করে যাচ্ছেন। আইয়ুব-ইয়েহিয়ার জুন্টার জুতো মি. ভুট্টো পরে নিয়েছেন—এইটুকুই সামান্য পার্থক্য। এমন কি জুন্টা পূব বাঙলার সম্মানিত নাগরিক মৌলানা ভাসানী, শেখ সায়েবকেও প্রপাগান্ডা থেকে নিষ্কৃতি দেয়নি—২৫ মার্চ ১৯৭১-এর আগেও। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে মৌলানা ভাসানী কল্পনাতীত বিরাট এক জনসভাতে তুমুলতম হর্ষধ্বনির মধ্যে পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন—অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও মৌলানাকে সমর্থন জানান। শেখ তখনো আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছেন পশ্চিম পাকের সঙ্গে দেশের মর্যাদা রক্ষা করে একটা সমঝোতার আশায়। ভাসানীর ঘোষণা যেন ছাপ্পর ফোড় করে অপ্রত্যাশিত ভাবে কিস্মতের কারণহীন বখশিশের মত জুন্টার মস্তকে বর্ষিত হল। পিণ্ডি, লাহোর, করাচীতে তখন দিনের পর দিন ভাসানীর আপন দেশের অবিরল বারিধারার মত, লাহোর পিণ্ডি ক্লাব-কাবারের উচ্ছ্বসিত মদিরা ধারাকে পরাজিত করে চললো কুৎসা প্রচার : "ভাসানী আসলে 'হিন্দু ভারতের' এজেন্ট। ভারতেরই প্ররোচনায় লোকটা হাটের মাঝখানে হাঁড়ি ফাটিয়েছে। শুধু তার দলই যে পূর্ণ স্বাধীনতা চায় তাই নয়, ভাসানীর (একদা) সহকর্মী অনুগামী শেখও ঠিক এইটেই চায়, সমঝোতার নাম করে শুধুমাত্র ভণ্ডামির মুখোশ পরে আপন 'ন্যায়সঙ্গত সামান্যতম দাবী'র একটা কেস (আলিবি) খাড়া করতে চায় বিশ্ববাসীর সামনে, শেষটায় যাতে করে পাকিস্তানের নিতান্ত ঘরোয়া মামুলী মতভেদটাকে এক ভীষণ প্রলয়ঙ্কর আন্তর্জাতিক সঙ্কটময় রূপ দিয়ে ইউ-এন-এ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, দু'একটা অর্বাচীন পক্ক-নিতম্ব ছোটাসে ছোটা দেশের দরদভী হাসিল করতে পারে। মোদ্দা কথা : ভাসানী যা শেখও তা।"...যতদূর জানি আচারনিষ্ঠ মৌলানা আপন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবশত (যদি সে বিদ্বেষ তিনি পোষণ করেন) তিনি বিশেষ বিশেষ নিরপরাধ হিন্দুর প্রতি না-হক নির্দয় হবেন এটা চট করে মেনে নিতে মন চায় না। যা হোক, তা হোক—তাঁকে "ভারতপ্রেমী" আখ্যা দিলে তিনি খুব সম্ভব মৌল ইদের মত "তুর্কী নাচন" আরম্ভ করবেন না, আম্মো পূর্ববৎ এটা চট করে গলতল করতে পারবো না। কিন্তু এহ বাহ্য।

এদিকে কিন্তু ঢাকার প্রায় তাবৎ পাবলিশার মিশ্রিত উল্লাস বোধ করলেন বটে কিন্তু পশ্চিম বাঙলার কোনো বই-ই ছাপাতে পারবেন না—সে লেখক ভারতচন্দ্রই হোন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমই হোন। যাঁদের পুস্তকে কোনো কপিরাইট নেই, কাউকে কোনো রয়েলটি দিতে হবে না—সেইটে হল তাঁদের প্রধান শিরঃপীড়া। কিছু কিছু লেখক অবশ্য অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করলেন। তাঁদের ধারণা : পশ্চিম বাঙলার সরেস বই গায়েব হয়ে গেলে তাঁদের নিরেস বই হু-হু করে, গরমকালে ডাবের মত, শীতের সাঁঝে চায়ের মত বিক্রি হবে। এই কিছু কিছুদের অনেকেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন, তাঁদের সৃষ্টি আদৌ নিরেস নয়, বিশেষত যাঁরা "ইসলামী তমদ্দুন"—সভ্যতা বৈদগ্ধ্য—সম্বন্ধে কেতাব রচনা করতেন। একজন কথাসাহিত্যস্রষ্টা আমাকে বলেন, "পূর্ব বাঙলার লোক যে কলকাতার বই পড়ে সেটা একটা বদ অভ্যাস মাত্র। সেই কফি হৌস, গড়ের মাঠ, কলেজ স্ট্রীট, ট্রাম গাড়ি, বোটানিকাল কিংবা 'ছেরামপুরী' পাদ্রী, হেস্টিংসের কেলেঙ্কারী ওসব ছাড়া অন্য পরিবেশের বই, যেমন বুড়ীগঙ্গা, রমনা মাঠ, নবাব বাড়ি, মোতিঝিলের কর্মচঞ্চলতা, নারায়ণগঞ্জের জাত-বেজাতের বিচিত্রতা—এদের গায়েতে এখনো সেই রোমান্টিক শ্যাওলা গজায়নি, ব্রোনজ মূর্তির গায়ে প্ল্যাটিনার পলস্তরা পড়েনি—ইত্যাদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্যাদি।" আমি বললুম, "পূব বাঙলার পরিবেশ, পূব বাঙলার জীবন নিয়ে যদি একটা সার্থক সাহিত্য গড়ে ওঠে তবে পশ্চিম বাঙলার কাছে সেটা হবে নূতন এক রকমের রোমান্টিক সাহিত্য। পাঠক হিসেবে বলছি, আমার মত বহু সহস্র লোক সেটা সাদরে গ্রহণ করবে। আর এই তো হওয়া উচিত। অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ডের এক বৃহৎ অংশ আর খাস জর্মনি তিন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে জর্মন সাহিত্যের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারা বয়ে আসছে বহুকাল ধরে—পরিপূর্ণ সহযোগিতাসহ। টমাস মান-এর জন্ম উত্তর জর্মনিতে অথচ জীবনের বেশীর ভাগ কাটালেন সসম্মানে সুইটজারল্যান্ডে। সঙ্গীতে দেখি, বেটোফেনের জন্ম বন শহরে অথচ জীবন কাটালেন ভিয়েনাতে। পূব বাঙলা যে একদিন নূতন গানের ঝরনা-তলা রসের ধারা নির্মাণ করবে সে বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।"

কিন্তু কার্যত দেখা গেল ঢাকার প্রকাশকমণ্ডলী খেয়ালী পোলাও খাওয়ার জন্য অত্যুৎসাহী হতে চান না।

"নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকির খাতায় শূন্য থাক!
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।"
(কান্তি ঘোষ)

ওদিকে আবার আছে তাদের দেদার নিউজপ্রিন্ট, নেই কিন্তু যথেষ্ট বই ছাপাবার কাগজ এটা ওটা সেটা বিস্তর জিনিস। এবং টেকসট বই যে সর্বাধিকার পাবে সে তত্ত্ব তো তর্কাতীত।

এবং যে-নিদারুণ সত্য পূব বাঙলায় তো বটেই, পশ্চিম বাঙলারও ভুলতে সময় লাগবে সেটা যখন ঠেকাবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্মৃতিতে আসে তখন দেহমন যেন বিষিয়ে যায় : শহীদ হয়েছেন যেসব অগ্রণী পথপ্রদর্শক লেখক তাঁদের সংখ্যা আদৌ নগণ্য নয়, প্রতিভাবান উদীয়মান লেখক অনেক, ছাত্রসমাজের উজ্জ্বল উজ্জ্বল মণিরাশি, অসংখ্য গুণগ্রাহী পাঠক, বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষক, আমার ভাগ্নের মত শত শত যুবক যুবতী যারা সাহিত্যিকদের সেবা করতো সগর্বে সানন্দে, সাহায্য করতো তাদের অতিশয় ক্ষীণতম বটুয়া থেকে যা বেরোয় তাই দিয়ে, বই কিনত সিনেমা জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে, বাঙলা ভাষার কণ্ঠরোধ করার জন্য পিণ্ডির হীন খল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যারা সম্পাদককে পাঠাতো স্বনামে তীব্রতম তীক্ষ্ণতম ভাষায় বেপরোয়া প্রতিবাদ—যার অধিকাংশ ছাপা হলে সম্পাদক লেখক গয়রহ নিঃসন্দেহে হতেন গবর্নর মোনায়েম খানের "রাজসিক" মেহমান। এরাই ছিল পূর্ণার্থে সর্বার্থে স্পর্শকাতর। তাই এরাই ছিল সব প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোধা, এরাই মুক্তিযুদ্ধের আহ্বায়ক, সহায়ক এবং নায়করূপে প্রথমতম শহীদ। এদের অনেকেই বেরিয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে একা একা, বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা কিন্তু হায়, "চৈত্রদিনের মধুর খেলা" খেলতে নয়, সেই চৈত্র মুসলিম গণনায় ছিল মহরমের মাস, আদর্শের জন্য শহীদ মাস—

"আমারে ফুটিতে হল
বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব
নির্মম গ্রীষ্মের পদানত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুদ্র তপস্যার বনে
আধো ত্রাসে আধেক উল্লাসে
একাকী বাহিরি এনু
সাহসিকা অপ্সরার মত।"
(সত্যেন দত্ত)(১)

পিশাচের দাবানলে ভস্মীভূত হবার জন্য।

উভয় বাঙলা—বাঙলা দেশের প্রধান সমস্যা

মাতৃভাষার ইতিহাস অধ্যয়ন, মাতৃভাষাকে জনসমাজে উচ্চাসন দান, সে ভাষাকে "পূত-পবিত্র" করার জন্য তার থেকে "বিদেশী" শব্দ লৌহ-সম্মার্জনী দ্বারা বিতাড়ন নানা রূপে নানা দেশে বার বার দেখা দিয়েছে এবং দেবে। এর সঙ্গে অনেক স্থলেই রাজনীতি জড়িয়ে পড়ে, কিংবা বিদেশী রাজার প্রতাপে যখন প্রপীড়িতজনের আপন বলে ডাকবার আর কোনো কিছুই থাকে না তখন অনেক ক্ষেত্রেই নিছক আত্মানুভূতির জন্য—"আমি আছি, আমার কিছু একটা এখনো আছে" সে তার শেষ আশ্রয় অবহেলিত মাতৃভাষার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তাকে পরিপুষ্ট করার জন্য দেশে আন্দোলন চালায়, চরমে পৌঁছে কভু বা মাতৃভাষা থেকে তাবৎ বিদেশী শব্দ ঝেঁটিয়ে বের করে, কভু বা মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার মাধ্যমে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় তাকে বয়কট করে, ২১শে ফেব্রুয়ারি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে, সেদিনটাকে বড়দিনের মত সম্মানিত করার জন্য হয় হরতাল করে নয় সরকারের উপর চাপ আনে সেটাকে যেন হোলি ডে রূপে স্বীকার করা হয় ও হলি ডে রূপে অনধ্যায় দিবস বলে গণ্য করা হয়। আন্দোলন জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা বাবদে এযাবৎ উদাসীন সুবিধাবাদী পলিটিশিয়ানরা (সুবিধাবাদী বলাটা নিষ্প্রয়োজন—অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রির বর্ণনাতে অন্ধকার না বললেও চলে) গুড়ি গুড়ি দলে ভিড়তেন কেন এবং যারা সত্য সত্য মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগতবশত বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আন্দোলনটাকে শক্তিশালী করে তুলেছিল তাদের হাত থেকে আন্দোলন পরিচালনা করার ক্ষমতা কেড়ে নেন?

এর পর যদি ধীরে ধীরে স্বরাজ আসে তবে মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত তথা সে-ভাষায় সুশিক্ষিত জন কিছুটা অবকাশ পান ভাষাটাকে গড়ে তোলার জন্য, যাতে করে স্বরাজ লাভের পর মাতৃভাষার সাহায্যেই সব শিক্ষাদীক্ষা রাষ্ট্রের সর্ব দৈনন্দিন কাজকর্ম সমাপন করা যায়। এ জাতীয় গঠনমূলক কর্মের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা খবরের কাগজে ফলাও করে আত্মপ্রশস্তি গাওয়ার সুযোগ নেই, স্বরাজ লাভের পর তো আরো কম।

জনপ্রিয়, শ্রদ্ধেয় লেখক "শঙ্কর" মাস দুই পূর্বে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখ উপলক্ষে

---

(১) উদ্ধৃতিতে ভুল থাকাটা আদৌ অস্বাভাবিক হবে না। ৫০।৫৫ বছর হল "চম্পা" কবিতাটি প্রথম পড়ি তারপর এটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। "চম্পার" প্রথম দর্শনেই কবিগুরু এমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সেটি তিনি ইংরিজিতে অনুবাদ করেন। আমার বাসনা যায় জানতে আর কোন্ কোন্ বাঙালী কবির কবিতা তিনি ইংরিজিতে অনুবাদ করেছেন। বহুকাল ধরে আমার আন্তরিক প্রার্থনা ছিল, সত্যেন দত্তের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী সম্পাদন করার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, "বাংলা ভাষা আজ ওপার বাংলাতেও তেমন প্রাণোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে না, যা কিছুদিন আগেও দেখা গিয়েছে। বাংলা ভাষাকে একাদশ কোটি মানুষের ভাবপ্রকাশের সার্থক মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে যে বিরাট কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন, তার সূচনা কোথায়?"

পশ্চিম বাঙলা বাবদে তাঁর ক্ষোভ : "এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত বাঙালী আবার মাতৃভাষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।....ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলে, ইংরিজি গান শুনে...এঁরা অজান্তে নিজ বাসভূমে পরবাসী সৃষ্টি করছেন। এঁদের ধারণা সন্তানদের বাংলা শিখিয়ে লাভ নেই। চাকরির জন্য প্রয়োজন ইংরিজি ইত্যাদি।"

এর সঙ্গে শ্রীযুক্তা উমা চট্টোপাধ্যায় যোগ দিয়েছিলেন, "কোনো কোনো স্বনামধন্য লেখক আজও ইঁট পাটকেলের মত অযথা ইংরাজী শব্দের ব্যবহার করেন।"

অনায়াসে বোঝা যাচ্ছে উভয় বাঙলার সমস্যা এক নয়। যদিও চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে উভয় বাঙলার সমস্যা প্রায় একই, বিশ্বসাহিত্যেও প্রায় তাই-ই। উভয় বাঙলার সার্থক সাহিত্য সৃষ্টিতে পার্থক্য থাকবে অত্যল্প এবং সেগুলো রসের বিচারে গৌণ। পূব বাঙলার অধিকাংশ লেখক মুসলমান—তাঁদের সৃষ্টিতে মুসলিম সমাজ চিত্রিত হবে অপেক্ষাকৃত বেশী। পশ্চিম বাঙলায় চিত্রিত হবে হিন্দু সমাজ। এ-স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, একশ বছর পূর্বে যখন বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ছিলেন তখন বাঙলাদেশের অনেকেই আশা করেছিলেন এঁরা তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ নগরের আলেখ্য অঙ্কন করবেন, অন্ততপক্ষে দূর দেশে বাঙালীর জীবনধারা তাঁদের নির্মিত অশ্রুজলে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি রসের মাধ্যমে কিছুটা চিনতে শিখবে। সে-আশা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নি ঠিক, সেই রকম পূর্ব বাঙলা থেকে আমরা সার্থক সাহিত্য তো আশা করিই। তদুপরি সে-সাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু অজানা অচেনা নয়া নয়া ছবি দেখতে পাবেন নিছক ফাউ হিসাবে গ্রেস মার্কের মত। "জয় বাঙলা"।

কিন্তু উপস্থিত পূব বাঙলার মোট সর্বৃহৎ সমস্যা—এবং একদিন সে সমস্যা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে-সত্যও জানি—সেটা বাঙলাদেশের তাবৎ সরকারী বে-সরকারী কাজকর্ম বাঙলারই মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায় কি প্রকারে? যেমন ধরুন, খাদ্য-সমস্যা। ঢাকায় খবর এল চাটগাঁয়ে চাল বড্ড আক্রা, রংপুরে ভালো ভালো ফসল হয়েছে। সে চাল তড়িঘড়ি ট্রেনে করে পাঠাতে হবে চাটগাঁ। ইতিমধ্যে ঢাকাতে টেলিফোনের নামকরণ হয়ে গেছে "দূরালাপনী" বা "দূর-আলাপনী"—'দূরালাপী" বোধ হয় নয়। আমি অবশ্য "দূর-বাকী", "দূর-বাচনী" নাম দিতে চেয়েছিলুম, কারণ প্রয়োজন হলে উষ্মা প্রকাশার্থে সন্ধি করে নিলেই হল, "দূর্বাকী" "দূর্বাচী" যা খুশি। কিন্তু কি দরকার। দীর্ঘ-ঊ-কে হ্রস্ব করে দিলেই হল। "দূরাশয়গণ অহরহ দুরালাপ করে", এই অর্থে "দুরালাপনী" বললে চলে যেতে পারে। কিন্তু "অনপনেয় কালি দিয়ে নাম সই করবেন' সত্যি প্রথম দর্শনে আমার মুখ কালিমাখা করে দিয়েছিল। কিন্তু ইনডেলবিল্-এর অন্য কি বাঙলা শব্দ হতে পারে? দূরপনেয় কলঙ্ক বাঙলাতে খুবই চলে। সে কলঙ্ক কষ্টসহ "মুছতে হয়" সেই ওজনে যে কালি কিছুতেই "মোছা যায় না"। অবশ্য উন্নসিক সম্প্রদায় আপত্তি তুলতে পারেন। "অনপনেয় কালিতে" গুরুচণ্ডালি দোষ বিদ্যমান। বলা উচিত ছিল অনপনেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মসি। তদুত্তরে বক্তব্য, ইহলোক ত্যাগ করার তিন বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলতি বাঙলা ভাষার একটা খতিয়ান নেন বা সিংহাবলোকন (সার্ভে) করেন; ইতিপূর্বে কবি বাঙলা ভাষা শব্দ-ধ্বনি-তত্ত্ব ব্যাকরণ নিয়ে অজস্র রচনা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু সেগুলো প্রধানত বা সর্বত সাধুভাষা নিয়ে। কিন্তু চলতি ভাষা এনে দিয়েছে নূতন নূতন সমস্যা। সে সমস্ত আদ্যন্ত আলোচনা করার পর বাঙ্ময় সম্রাট দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে রাজাদেশ প্রচার করেন।

"সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে গুরুচণ্ডালি অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।"

অপিচ

"অমুকের কণ্ঠে গানে 'দরদ' লাগে না বললে ঠিক কথাটি বলা হয়। গুরুচণ্ডালির শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে "সংবেদনা" শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে অমান্য করলে অপরাধ হবে না।" (বাংলা ভাষা পরিচয়, র র ২৬ খণ্ড পৃ ৩৯৫ ও পঃ)

কিন্তু এহ বাহ্য। তবু যে এই সঙ্কটের কথাটা উল্লেখ করলুম, তার কারণ পূব বাঙলার লোক গুরুচণ্ডালি পণ্ডৎপ্রকর্ষতা দোষ সম্বন্ধে পশ্চিম বাঙলার চেয়ে ঢের বেশী সচেতন।

মোদ্দা কথা এই ফোন যন্ত্রটির পরিভাষা কি হল না হল তার চেয়ে ঢের বেশী মারাত্মক রেলের এঞ্জিনচালক, সিগনেল ম্যান, গার্ড সাহেব, বিজলির মিস্ত্রি ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য লোক তাদের তরো বেতরো যন্ত্রপাতি কলকব্জার কি পরিভাষা নির্মাণ করছে। সামান্য ভুল বোঝাবুঝির ফলে দুর্ঘটনা ঘটাটা মোটেই অকল্পনীয় নয়।

ওদিকে প্রাচীন দিনের ব্যুরক্রেটরা রাতারাতি বাঙলাতে জটিল জটিল সমস্যার বিশ্লেষণ তাদের টীকা, প্রস্তাবের মুসাবিদা লিখবেন কি প্রকারে? সিকিশিক্ষিত এক ইমাম সাহেব খামোখা বেমক্কা আমাকে বলেন, "আপনি তো 'বাঙলা বাঙলা' বলে চেল্লাচ্ছেন কবে সেই বাবা আদমের কাল থেকে—যদিও এ বাবদে আমাদের ইঁটের মান দিকধিড়িঙ্গে প্রামাণিক গ্রন্থে আপনার উল্লেখ নেই—।" আমি হাতজোড় করে বললুম, "রক্ষে দিন, ইমাম সাহেব! আপনার পরবর্তী ইস্টিশন বেহেশতে ফিরিশতাদের বাঙলা বলতে হবে এহেন ফতোয়া তো আমি কখনো দিই নি—।" "জানি, জানি। কিন্তু ঐ যে আপনাদের সংবিধান না কি যেন তৈরি হল তার দুটো তসবীর। একটা বাঙলাতে অন্যটা ইংরিজিতে। এবং সাফ জবানে বলা হয়েছে, অর্থ নিয়ে মতবিরোধ যদি হয়, তবে ইংরিজি তসবীরই প্রামাণিক আপ্তবাক্য।" আমি বিশ্বাস করিনি এবং হলেও আমার কণামাত্র ব্যক্তিগত আপত্তি নেই।

কিন্তু এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং শেখজী থেকে বিস্তর লোক হরহামেশা বাঙলার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন। কিন্তু তাঁদেরও তো মাঝে মাঝে ধোঁকা লাগে, কোনো ইংরিজি শব্দের সঠিক বাংলা পরিভাষা কি। তখন ফোন করা হয়, কিংবা ডাক পড়ে প্রবীণ সাহিত্যিককে বা সাহিত্যিকদের। তাঁরাই বা কজন সর্বসাকুল্যে বেঁচে আছেন এখনো টিক্কা, অল-বদর, শান্তি কমিটি, বেহারীদের টেলিস্কোপ মাইক্রোস্কোপ সংযুক্ত 'ডবল জালে'র ছাঁকনি এড়িয়ে! দেশের কাজকাম যদি বন্ধ হয়ে যায়—হবে না, আমি জানি—তবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর প্রথম দুটি বস্তু আসবে কোথা থেকে? কিছুদিন পূর্বে বাঙলাদেশের সদরে সে দেশের মোস্ট ইমিডিয়েট নির্ঘন্টের যে বয়ান শুনলাম, জনৈক করিতকর্মা ব্যক্তির কাছ থেকে, তার থেকে আমার মনে হল, উভয় বাঙলার যে সব সাহিত্যিক, শব্দতাত্ত্বিক পরিভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কুইন্টপ্লেট থাকলেও মোটামুটি চলনসই কিন্তু অতি অবশ্য দেশ শাসনের সর্ব শাখা প্রশাখা পরিব্যাপ্ত পরিভাষা নির্মাণ শেষ হবে না। এবং যেটুকু হবে, তাতেও থাকবে প্রচুর অসম্পূর্ণতা, বিস্তর অনূদিত ইংরাজী লাতিন শব্দ পূব বাঙলার শস্যশ্যামল দেশে সঙ্গিনের মত খোঁচা খোঁচা খাড়া দাঁড়িয়ে স্পর্শকাতরা শ্রদ্ধেয়া উমা চট্টোপাধ্যায়ের মত একাধিক নর-নারীকে পীড়া দেবে, যদিও তাঁরা প্রধানত সাহিত্যেই এ-অনাচারে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু উপায় কি? একমাত্র আশা ঐ অসম্পূর্ণ দুর্বল পরিভাষা দিয়েই কোনো গতিকে কাজ চালিয়ে যাবে।

বারান্তরে সমস্যাগুলো নিয়ে আরো আলোচনা করার আশা রাখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থ-পরিচয়
পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়

১

'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' প্রথম প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৮২ সালে। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩। পৃষ্ঠা ১৪০-৪। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ আশু বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত। এই গ্রন্থটি সম্ভবত লেখকের শেষতম রচনা। 'বাংলাদেশ'-এর স্বাধীনতার পরে লেখক বাংলাদেশে যখন কিছুকাল অবস্থান করেন, সেই সময়ই এই প্রবন্ধগুলি লেখা হয়। সেখানকার পাঠক মহল ও সাহিত্যিক সমাজ বরাবরই লেখকের রচনার অনুরাগী ছিলেন। যেহেতু তদানীন্তন শাসকমণ্ডলী সে দেশে ভারতীয় সাহিত্যের প্রচার চাইতেন না, উপরন্তু সৈয়দ মুজতবা আলীর রাজনৈতিক মতে তাঁদের বীতরাগ ছিল সেজন্য তাঁর রচনা বড় একটা সে দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে "পূর্বদেশ" পত্রিকার আগ্রহে এই রচনাটি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় সমসাময়িককালে আফগানিস্তানে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়। "পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়" সেই পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। "পূর্বদেশ" পত্রিকায় 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়'র পরে আরও কয়েকটি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলিও এই গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রকাশকের ভূমিকার অংশবিশেষ লক্ষণীয় : "এই রচনার প্রথম ও প্রধান বক্তব্য রাজনীতিতে সর্বথা সর্বদা পুরাতনই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। যা আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তন বলে মনে হয়, আসলে তা পুরাতনেরই বেশ-পরিবর্তন। এই প্রসঙ্গে লেখক আফগানিস্তান ও অনুরূপ দুর্বল দেশের পৃষ্ঠপটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মহাশক্তিগুলির রাজনীতি ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে তাঁর বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তাঁর যাওয়ার সুযোগ হওয়ায় পাকিস্তানের নেতাদের বিশেষ করে ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার রাজনীতিক মতলব কি ছিল, তাদের কোথায় কোথায় মূর্খতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তা তাঁর অভিজ্ঞ বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই গ্রন্থের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লেখকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সরস লেখনীর যেন এক নূতন পরিচয় পাওয়া যায়।"

২

বিদেশে

'বিদেশে' রচনাটি ১৯৭১ সালে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় পঞ্চতন্ত্র শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। এখনও পর্যন্ত এই রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। তবে এর প্রথমদিকের কিছু অংশ 'মুসাফির' গ্রন্থের শেষের দিকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত অংশটি এখানে পুনর্মুদ্রণের কারণ এই অংশটির সঙ্গে 'বিদেশে'র বাকী অংশের অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সন্ধান করার সময়ে এই রচনার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্যবধানে সৈয়দ মুজতবা আলী আবার ইউরোপ যাত্রা করেন। পুরাতন স্মৃতি ও পুনর্দর্শনের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে আনন্দবেদনায় ভরা এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতুলনীয় ভ্রমণ-সাহিত্য বাঙালী পাঠক লাভ করেছে লেখকের এই ভ্রমণযাত্রার ফলে। মুসাফির, বিদেশে প্রভৃতি রচনা তারই দৃষ্টান্ত। লেখকের তরুণ বন্ধুরা এখন অধিকাংশই প্রৌঢ়। তাঁদের সঙ্গে বসে বসে পুরাতন স্মৃতির রোমন্থন, পুরাতন প্রিয় স্থানগুলির পরিবর্তনে ও সমাজের বিবর্তনে লেখকের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, লেখকের বন্ধু-বান্ধবের বিগত ত্রিশ বছরের ঘটনাবলীর বর্ণনা 'বিদেশে' গ্রন্থের বিষয়বস্তু।'

৩

বাঙলাদেশ ও উভয় বাঙলা

এই রচনা দুটিও এযাবৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এগুলি পঞ্চতন্ত্র শিরোনামায় ১৯৭২ সালে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাকিস্তানের নানা রাজনৈতিক কূটনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ষড়যন্ত্র ও তার তৎকালীন নেতাদের চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এই গ্রন্থে। দেশ-বিভাগজনিত সমস্যা ও তার জন্য উভয় বাংলার অধিবাসীদের সুবিধা-অসুবিধার কথাও লেখক চিন্তা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশ পূব পাকিস্তান থাকাকালে সেখানে বসবাসকারী লেখকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বিপদাশঙ্কায় লেখক ইতিপূর্বে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী নেতাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্তভাবে লেখনী ধারণ করতে পারেন নি। এই রচনাতেই তাঁর লেখনী প্রথম স্বৈরাচারী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে। সেদিক দিয়ে এই রচনা লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের একটি প্রামাণ্য দলিলরূপে গণ্য হবে।

—চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

—অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~